সমুদ্রের স্বাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দি বুকম্যান
৮৩ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা, ১৩

প্রকাশক
দি বুকম্যানের পক্ষ হইতে
শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ
৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য সাড়ে তিন টাকা
প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৫২

মুদ্রাকর : কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

লেখকের কথা

ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্ম-বিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা। জানা না থাকলেও সত্যই কি মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল যে নিজেকে জানতে পারলে এ সমাজ আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই নতুন করে নিজেকে গড়তে পারবে—বিকার ছেঁটে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠবে? আজ নিজের লেখাগুলি আবার পড়ে বুঝতে পারি, সেরকম জোরালো বিশ্বাস ছিল না। আমিও যে মধ্যবিত্ত, পথ খুঁজে না পাওয়ার আতঙ্কে বিহ্বল ও উদ্‌ভ্রান্ত বলেই নির্মম আত্ম-সমালোচক, এর প্রমাণটাই বড় হয়ে আছে বিশ্বাসের চেয়ে।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি। পথ খুঁজে না পাই, পথের ইঙ্গিত জেনেছিলাম। তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনার মূল্যে আমি আজও বিশ্বাসী।

মাণিক বন্দোপাধ্যায়
১লা ফাল্গুন, ১৩৫৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সমুদ্রের স্বাদ ... ১
ভিক্ষুক ... ১৩
পূজা কমিটি ... ২৭
আপিম ... ৩৯
গুণ্ডা ... ৫২
কাজল ... ৬৩
আততায়ী ... ৭৭
বিবেক ... ৯৬
ট্র্যাজেডির পর ... ১১৩
মালী ... ১২৪
সাধু ... ১৩৭
একটি খোয়া ... ১৪৪
মানুষ হাসে কেন ... ১৫৩

সমুদ্রের স্বাদ

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সাতবছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কি আশ্চর্য্যই সে হইয়া গিয়াছিল! এ কি সম্ভব? কই, সে তো রেলে চাপিয়া কত দূরদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামাবাড়ী যাইতে সকাল বেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্য্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই। চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্য্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ীর সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলিকাতায় সায়েব-কাকার ছেলে বিনুদা বিলাত গেল,—সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ-তরকারীতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা দু'বেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরী হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া! সারাদিন গরমে ছটফট করার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে!

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণদিকে বাবা ?'

'চাদ্দিকেই সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর—আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র ? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্ব্বত, তারপর তিব্বত আর চীন ! ম্যাপটা আবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা ?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারও দিলেন। সমুদ্র দেখানোর আর হাঙ্গামা কি ? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামত একবার বোধ হয় যাইতেও হইবে। নীলার মা'র অনেক দিনের সাধ।

কিন্তু কেরাণীর স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায় ! অনেক কষ্টে একরকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদি বা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময়ে যে ভীড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে ? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকাতেও কুলায় না। একজনকে নিলে অন্য সকলেই বা কি দোষ করিল ? নীলা সঙ্গে গেলে ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনাই বা করিবে কে ?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরও কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।'

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন চোখের জলের নোন্‌তা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার ভুলিয়া গেল অন্য কিছুর স্বাদ। মা-বাবা তীর্থ

সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা?'

গাড়ী হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া, জিরিয়ে নিই, বলব'খন সব।'

কি বলিবেন? কি প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র-স্নানের বর্ণনা শোনে নাই? বলাইদের বাড়ীর তিনতালার ছাতে উঠিয়া চারিদিকে যেমন আকাশ পর্য্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি-রাশি বাড়ী দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ীর সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া সাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও কি এতটুকু ফাঁকি আছে নীলার? কেবল চোখে দেখা হইল না, এই যা। বাপের আদুরে মেয়ে সে, অন্তত সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইল না, কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া, স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পূজোর সময় যেমন ক'রে পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হ'লে তাও করব। কাঁদিস নে নীলা, সারারাত গাড়ীতে ঘুমোতে পাইনি, দোহাই তোর, কাঁদিসনে।'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পূজার সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোনতা

স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয়, বাড়ীর সকলেই কাঁদিল। কিছুদিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মত দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরও কতবার নীলা কাঁদিয়াছে। বাড়ীর শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে, পেটের ব্যথায়, ফোঁড়ার যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও সে দু'চারবার কাঁদে নাই এমন নয়। এমন কষ্ট হয় কাঁদিতে!—দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারি হইয়া যায়, জ্বর হওয়ার মত সর্ব্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মত ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দু'রকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে,—বৈচিত্র্যহীন আলুনি এবং কড়া নোন্‌তা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে অন্যরকম—রক্তের স্বাদের মত। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে, কোন-কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে,—রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ী গেল। বিয়ের যুগ্যি

মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফঃস্বলের ছোট সহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মা'র ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর ক'টা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হ'তনা দাদা? একটা ছোটখাট বাড়ী ঠিক করে' নিয়ে—'

নীলার মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

'ও!' বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, সহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ী গেল। সকালে গাড়ীতে উঠিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে যেখানে পৌঁছানো যায়। স্থানটির পরিবর্ত্তন হয় নাই, অনেক কালের ভাঙা ঘাটওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আমবাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়ীটিরও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মামার, মামীর, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে! কোথায় সেই মামাবাড়ীর আদর, সকলের অনন্দগদগদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার তো একবারও কেউ বলিল না, এটা খা—ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না? একটু কাঁদিবে নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ীর অনাদর অবহেলার জন্য একটু বেশী রকম কান্না?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনো পরে নাই, গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই, কলসী কাঁখে জল আনে

নাই, বিছানা তোলা, মসলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক খারাপ কথার বকুনি শোনে নাই। হায়, একটা ভাল জিনিষ পর্য্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিতেই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে কোন ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়! কিন্তু তার না হয় অভদ্ররকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাইবোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা-পায়সের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারীর ছেলের মত বেশ করিয়া তার ভাই দু'টিকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দু'বেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে, এটা নীলার খেয়ালও থাকে না, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহার-বিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড় মামী বলেন, 'বড় তো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?'

মেজমামী বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খেয়েছ একেবারে!'

নীলার মা বলেন, 'দাও না তোমরা ওর একটা গতি করে, মেয়ে যে দিন দিন কেমনতরো হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে কি আবার সহরের সেই বাড়ীর মত একটা বাড়ীতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর-যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখিতে পাইবে, বলাই-এর মত কারও কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে? ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কি একটা অজানা অসুখে

ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজ মেয়ে সন্তান প্রসব করিতে বাপের বাড়ী আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একেবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপর দিকের বাড়ীতেও একটি মেয়ে আরও আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল, একদিন রাতভোর চেঁচাইয়া সে মরিয়া গেল নিজেই। আমবাগানের ওপাশে আটদশখানা বাড়ী লইয়া যে পাড়া, সেখানেও পনের দিন আগে-পিছে দু'টি বাড়ী হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালই হইয়াছে বলা যায়। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু যা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা-মরা, চোখ দু'টা নিস্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামারবাড়ীর অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোটভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকালো ছিল, একটু অতিরিক্ত পারিপাট্য ছিল তার নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠন-বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। বিশেষ আর এমন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে জীবনের? বাস কেবল করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথাবার্ত্তা চালচলন নীলা ভাল বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে

হয় একটি আধ-পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্ত্তা চালচলন আরও বেশী দুর্ব্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজায় খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কি যে সে বলিতে আরম্ভ করে নীলা ভাল বুঝিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে, আবেগে উত্তেজনায় অনাদি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরী হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়াই যাইত। কোনদিন ঘরে আসিয়া দেখিতে পায় অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবেনা, নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কি বলিবার আছে, কি করিবার আছে? হয় দাঁতের ব্যাথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলেই নীলা চুপি চুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মত স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনদিন করে নাই, কি রকম স্বামী পাইলে সে সুখী হইবে কোনদিন সে কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার নাই। আশাই যে করে নাই তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই সোহাগ পাওয়ার সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগরদোলায় ক্রমাগত স্বর্গ ও নরকে ওঠা-নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবনযাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বাতিল করিয়া দিয়া সকলের মত সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে স্বর্গই সত্য, বাকী সব নিছক

দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েদের সব নয়, গত জীবনের একটা বড়রকম প্রত্যাবর্ত্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সহরে তাদের সেই আগেকার বাড়ীতে থাকা, সকলের না হোক অন্ততঃ একজনের কাছে সেইরকম আদর যত্ন পাওয়া, অবসর সময় বলাইদের মত কোন প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ীর ছাতে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ীর সমুদ্র দেখা আর বলাই-এর মত কারো মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে। এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ীর চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে, এখানে তাকে যে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে, সে নিজেও তেমনি আপনা হইতে সেটা অনুভব করিয়াছে। মামাবাড়ীর চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশী। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁঝালো স্বাদ সে প্রথম অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া এই কথাটাই দিবারাত্রি মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়াইতেছে যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই—শানাই বাজাইয়া একদিনে তার জীবনের সাধ আহ্লাদ সুখ দুঃখ আশা আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কি হয়েছে?'

'কাঁদিনি তো।'

কাঁদিতে কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি, কি আসিয়া যায়? কাঁদা আর না-কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার

কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন আনিয়া দিয়াছে এমনি ভাবে অনাদি তাকে আদর করে, ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায়, কেন কাঁদিতেছে নীলা, কি হইয়াছে নীলার? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে? মা-বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনি অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু কি বলিবে নীলা, বলার কি আছে? সে কি নিজেই জানে, কেন সে কাঁদিতেছে? আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোন্ কান্না বকুনির, কোন্ কান্না অভিমানের, কোন্ কান্না শোকের, আর কোন্ কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মত জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমত ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর! আরও বেশী আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দু'দিন নীলা কাঁদে কিনা সেই জানে, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না সুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কি হয়েছে যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিলনা, এবার স্বামীর একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরও বেশী আকুল হইয়া

কাঁদিতে পারিত, কিন্তু ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে থামিয়া গেল :

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার ?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে ?'

'না।'

'তবে ?'—নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতও ব্যথা করিতেছে না, মাথারও যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন, বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন ? দাঁতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয় !

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষে, মাঝে মাঝে কোন উপলক্ষ ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে, বৌ-এর তার কান্নার কোন কারণ নাই, বৌটাই তার ছিঁচ্‌কাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা-ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এদ্দিন বলিনি তোকে, কি জানি হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্তনা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি—বড্ড ছিঁচ্‌কাঁদুনে বৌ তোর। একটু কিছু হ'ল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আগে ভাবতাম,

বৌ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম ! আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ও-বাড়ীর কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এলো, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে সে কি কান্না বৌয়ের ! সমুদ্দুরের চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে' গেল। যাবার সময় চুপি চুপি আমায় বলে গেল, বৌকে মাদুলী তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভাল নয়।'

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন্। শুনলি ?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারী কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে, সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

ভিক্ষুক

রাত্রি প্রায় আটটার সময় জনহীন ক্ষুদ্র ষ্টেসনটিতে যাদবকে নামাইয়া দিয়া বিনা সমারোহে ট্রেণটা চলিয়া গেল। যাত্রী নামিয়াছিল মোটে তিনজন, তাদের একজন যাদব নিজে। টিকিট আদায় করিয়া ষ্টেশন মাষ্টার গিয়া ঢুকিল তার ঘরে আর টিমটিমে তেলের আলো দুটি নিভাইয়া দিয়া কুলীটাও তার কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন যাদব প্রথম টের পাইল, বছরখানেক সহরে বাস করিয়াই মফঃস্বলের অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে তার পরিচয় অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কোমরে বাঁধা টাকাগুলির জন্য অন্ধকার রাত্রে ছ'সাত মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে ভয় করিবে, এতক্ষণ কে তা ভাবিতে পারিয়াছিল? শেষ রাত্রে চাঁদ উঠিবে, এখন চারিদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। তারার আবছা আলোয় পথের আরম্ভটা মোটামুটি স্থির করা যায় মাত্র। তবে অনেকগুলি বছর বৌ-এর বাপের বাড়ীতে বেকার বসিয়া শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে হওয়ায় ষ্টেসন হইতে সেই গ্রাম পর্য্যন্ত পথটি যাদবের এত বেশী পরিচিত যে কল্পনায় দুপাশের বিস্তীর্ণ মাঠ আর ক্ষেত, আমবাগান আর জঙ্গল এবং মাঝে মাঝে কাছের ও দূরের দু'একটি ছোট ছোট ঘুমন্ত গ্রাম সে পরিষ্কার দেখিতে পায়। ষ্টেসনের বাহিরে দিগন্তব্যাপী রহস্যময় পাতলা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তার মনে হয়, রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু তারপর আবার মনে হয়, তাতেই বা লাভ কি! সঙ্গে কিছু টাকা আছে বলিয়াই যদি একা এতটা পথ যাইতে তার ভয়

করে এখানে থাকিলেই বা এমন কি নিরাপদ আশ্রয় তার জুটিবে, যেখানে টাকার ভাবনা না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রিটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেওয়া চলিবে? ষ্টেসন-মাষ্টারের ঘরের সামনে ওই তিন হাত চওড়া শেডটার নীচে সরু বেঞ্চটাতে শুইয়াই সম্ভবতঃ রাতটা তার কাটাইয়া দিতে হইবে, এই জনশূন্য ফাঁকা ষ্টেশনে!

টাকা যে তার সঙ্গে আছে, এ খবরটা তো কারও জানিবার কথা নয়। সহরে এগার মাস চাকরী করিয়াই সে যে শ'খানেক টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে আর সবগুলি টাকা সঙ্গে নিয়াই ছেলেমেয়ে ও বৌকে সহরে নিয়া যাইতে আসিয়াছে, এরকম একটা ধারণা চোর ডাকাতের মনে আসিবে কেন? তাছাড়া, ছুটি মোটে তার দুদিনের, একটা দিনতো কাটিয়াই গেল। কাল সকলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বেলা তিনটার গাড়ী ধরা চাই, পরশু কাজে না গেলে চলিবে না—তার কত দুঃখে সংগ্রহ করা কত কষ্টের কাজ!

আজ রাত্রেই গিয়া শ্বশুরবাড়ী হাজির হওয়া ভাল। সকালে উঠিয়াই রওনা হওয়ার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইবে।

মনের মধ্যে এতগুলি যুক্তি খাড়া করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেও কেমন যেন ফাঁপর ফাঁপর লাগিতে লাগিল যাদবের। ষ্টেসনের কিছু তফাতেই কয়েকখানা খড়ো ঘর নিয়া ছোট একটি বস্তি, ইতিমধ্যেই নিঝুম হইয়া গিয়াছে। বস্তিটি পার হইয়া যাওয়ার পরেই চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, অন্ধকারে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না, তবু যেন দেখা যায়, কারণ দিগন্তের সীমায় আকাশ নিজেকে দৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। দেহমনের একটা খাপছাড়া অস্বস্তিবোধ ক্রমেই জোরালো হইয়া উঠিতে থাকে এবং যাদবের আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে ভয়ের উৎসটা শুধু তার কোমরে বাঁধা টাকাগুলি নয়।

অজানা অচেনা মানুষকে সঙ্গী করিয়া পথে চলিবার আশঙ্কাটাই এতক্ষণ যাদবের মনে প্রবল হইয়াছিল, এখন তার মনে হইতে থাকে, যেমন হোক একজন রক্তমাংসের সঙ্গী থাকিলেই ভাল হইত। এরকম কত অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যে এতকিছু দ্রষ্টব্য থাকে, স্তব্ধতার মধ্যে এত শব্দ শোনা যায় আর নির্জ্জনতার মধ্যে এমন সব উপস্থিতি অনুভব করা যায়, কোন দিন তার জানা ছিল না। যাদব থমকিয়া দাঁড়ায়। একবার ভাবে, ফিরিয়া গিয়া বস্তি হইতে পয়সা কবুল করিয়া একজন লোক সংগ্রহ করিয়া আনিবে কিনা। আবার ভাবে, ভূতের ভয়ে কাবু হইয়া আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইবে? রাম নাম জপ করিতে করিতে চোখ কাণ বুজিয়া কোন রকমে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছানো যাইবে না? ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতিগত ভীরুতার ঠেলায় কখন যে ষ্টেসনের দিকে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দেয় নিজেই ভাল করিয়া টের পায় না।

এমন সময় জোটে তার সঙ্গী। রক্ত মাংসের লম্বা চওড়া বিরাট দেহ সঙ্গী।

দূর হইতে মানুষটাকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়াই যাদবের বুকের মধ্যে প্রথমটা ধড়াস করিয়া ওঠে। কয়েক মূহুর্ত্তের জন্য সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া যায়। তারপর তাকে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক যখন ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করে সে কে, দেহে যেমন জীবন ফিরিয়া আসে এবং কাছে আগাইয়া আসিলে গায়ে পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর আর পায়ে জুতা দেখিয়া ফিরিয়া আসে চিন্তা করার ক্ষমতা।

'মশায় যাবেন কোথা?'

'সোদপুর।'

যাদবের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের কাছেই সোদপুর গ্রাম। শরীর মন যেন যাদবের হাল্কা হইয়া যায়। নিশ্চিন্ত মনে সে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে আরম্ভ করে। যাদব যে তার দিকেই আগাইয়া চলিতেছিল হঠাৎ দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে এটা আগন্তুকের কাছে ধরা পড়ে নাই, গতিবেগ খানিকটা কমাইয়া সে বলে, 'একটু আস্তে হাঁটি, নয়ত আপনার কষ্ট হবে।'

যাদব সবিনয়ে বলে, 'আজ্ঞে না, কষ্ট কিসের?'

'পিছন থেকে এসে ধরে ফেললাম, একটু আস্তে হাঁটেন বৈকি আপনি।'

কথা আর গলার সুর শুনিয়া মনে হয়, অপরিচয়ের ব্যবধানটা পুরাপুরিই আছে বটে তবু যেন তারা পরস্পরের আপন জন, পরমাত্মীয়। তাই স্বাভাবিক, মানুষ যখন মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে তখন আর তারা অনাত্মীয় থাকিবে কেন? প্রান্তরবাহী এই পথের বুকে যে বিচ্ছিন্ন ও অসাধারণ জগতে তাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে সেখানে একজনের কাছে অন্য জন শুধু মানুষ। কিন্তু জীবনের সাধারণ অসাধারণ বাস্তব অবাস্তব সমস্ত আবেষ্টনীর মধ্যেই ভয় আর সন্দেহ জীবনকে শুধু খাপছাড়া যাতনাভোগের নেশায় ভরিয়া রাখিয়াছে, তার মন কেন বেশীক্ষণ সঙ্গীলাভের স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত ভাব আর মানুষকে মানুষ মনে করার সহজ বুদ্ধি বজায় রাখিতে পারিবে? কোথা হইতে আসিতেছে আর কোথায় যাইবে এই চিরন্তন ধরা-বাঁধা প্রশ্নের পর সঙ্গী যখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, সহরে সে করে কি, যাদবের মনে একটা খটকা লাগে। সত্য কথাটা বলা কি উচিত হইবে, সহরে সে চাকরী করে, গত এগার মাস ধরিয়া মাসে মাসে নিয়মিত বেতন পাইয়াছে?

গায়ে পাঞ্জাবী থাক, কাঁধে চাদর থাক, পায়ে জুতা থাক, মানুষটা আসলে কেমন, তাতো আর সে জানে না। বাহিরের পোষাকে ভিতরের পরিচয় আর কবে জানা গিয়াছে মানুষের?

সে সহরের চাকুরে-বাবু, এ খবরটা শুনিয়া যদি লোভ জাগে মানুষটার, অতি সহজে কিছু রোজগার করার এমন একটা সুযোগ পাইয়া যদি আত্মসম্বরণ করিতে না পারে, গলাটা টিপিয়া ধরিয়া যদি বলিয়া বসে, 'যা কিছু সঙ্গে আছে দাও'—কি হইবে তখন? তার চেয়ে মিথ্যা বলাই নিরাপদ।

'কি করি? আজ্ঞে, করি না কিছুই।'

শুনিয়া যাদবের সঙ্গী খানিকক্ষণ আর সাড়া শব্দ দেয় না। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলা দিয়া যাওয়ার সময় দুজনে গাঢ় অন্ধকারে যেন একেবারে হারাইয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন পথে আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে বিনা ভূমিকায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্কটা স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল, বটগাছের তলের গাঢ়তর অন্ধকারটাই যেন তাকে পরিণত করিয়া দেয় নিষ্কর্ম্মা বেকার মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। পরিণতিটা এত স্পষ্ট হয় যে, সঙ্গীর গলার আওয়াজ শুনিয়া যাদব পর্যন্ত টের পাইয়া যায়।

'আপনার চলে কি করে?'

'চলে? আজ্ঞে, চলে আর কই!'

'ছেলে মেয়েকে আনতে যাচ্ছেন বললেন না?'

'আজ্ঞে না, আনতে নয়। দেখতে যাচ্ছি।' বলিতে বলিতে যাদবের খেয়াল হয়, যার দিন চলে না, বিশেষ কোন কারণ ছাড়া পয়সা খরচ করিয়া ছেলে মেয়েকে দেখিতে যাওয়ার সখটা তার পক্ষে একটু খাপছাড়াই হয়। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার তাই সে

বলিতে থাকে, 'যাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাব কিনা ভগবান জানেন। চারদিন আগে খবর পেলাম, বড় ছেলেটা মর মর। তা গাড়ী ভাড়ার দেড়টা টাকাই বা কে দেবে যে দেখতে আসব? শেষকালে আর সইল না মশায়, ভাবলাম, যাই যাব জেলে, উপায় কি! বিনা টিকিটে গাড়ীতে চেপে বসলাম। গিয়ে যদি দেখি শেষ হয়ে গেছে—'

বড ছেলে ভোলার বছর দশেক বয়স হইয়াছে, বড় রোগা আর বড় শান্ত ছেলেটা। যাদবের মনটা খুঁত খুঁত করিতে থাকে, ছেলেটার বদলে অন্য কাউকে মর মর করিলেই ভাল হইত। কিন্তু মরণাপন্ন সন্তানের মত করুণ রস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কার আছে? সঙ্গীর কাছে নিজেকে দরিদ্র প্রতিপন্ন করার ইচ্ছাটাই যাদবের ছিল, নিজের জীবনে এত সব চরম দুঃখ আমদানী করিয়া ফেলিতেছে কেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বানাইয়া বানাইয়া লোকটিকে এসব কথা বলার কি প্রয়োজন তার ছিল? কিন্তু থামিতে সে পারে না, সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গী তাকে দুটি একটা প্রশ্ন করে আর সে অনর্গল জীবনের চরম দুঃখ দারিদ্র্যের শোচনীয় কাহিনী বলিয়া যায়। কপাল, সবই মানুষের কপাল। নয়তো একজন মানুষের জীবনে কখনও এত দুর্ভাগ্য ভিড় করিয়া আসিয়া হাজির হয়! এদিকে সহরে সে দুটি পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রাণপাত করে, আঁজলা ভরিয়া রাস্তার কলের জল খাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটায় আর এদিকে আত্মীয়ের আশ্রয়ে বৌ ছেলেমেয়ে তার পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যায়। অথচ একদিন তার কি না ছিল! বাড়ী ছিল, জমিজমা ছিল, কত আত্মীয় পরিজনকে সে আশ্রয় দিয়াছে। বলিতে বলিতে গভীর বিষাদে যাদবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, গলা ভারি হইয়া আসে। মাঝে মাঝে সে ভুলিয়াই যায়, সে যা বলিতেছে কিছুই তার সত্য

নয়, নিজের কাল্পনিক কাহিনীতে নিজেই অভিভূত হইয়া তার মনে হইতে থাকে, উঃ, কি কষ্টই সে পাইয়াছে জীবনে ?

পথের শেষের দিকে সঙ্গী লোকটি একটু বেশী রকম চুপচাপ হইয়া যায়, কি যেন ভাবিতে থাকে। যাদবের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের গা ঘেঁষিয়া পথটি সোদপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে ছাড়াছাড়ি। বিদায় নিয়া যাদব গ্রামের দিকে পা বাড়াইয়াছে, লোকটি ডাকিয়া বলে, 'একটু দাঁড়ান তো !'

কাছে আসিয়া যাদবের হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া সে বলে, 'আপনার ছেলের চিকিৎসা করাবেন।'—বলিয়াই হন হন করিয়া আগাইয়া যায়।

তারার আলোতেও যাদব বুঝিতে পারে, কাগজটা একটা দশ টাকার নোট।

প্রথমে যেমন বিস্ময় জাগিয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল আনন্দ। সকলকে সহরে নেওয়ার খরচটা ভগবান জুটাইয়া দিলেন। ঘরের পয়সা আর খরচ করিতে হইবে না। কথাটা যাদবের মনে নানা ভাবে পাক খাইয়া বেড়াইতে থাকে। সে তো কোন সাহায্য চায় নাই, তবু ভদ্রলোক যাচিয়া তাকে একেবারে দশ দশটা টাকা দান করিয়া ফেলিলেন কেন ? বিশেষ বড়লোক বলিয়াও তো মনে হয় নাই মানুষটাকে ? তার বানানো দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এমন ভাবে মন গলিয়া গেল যে একেবারে দশটা টাকা তাকে না দিয়া সে থাকিতে পারিল না ?

সকলকে নিয়া যাদব সহরে ফিরিয়া যায়। আগেই যে খোলার ঘরটি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল সেখানে গিয়া ওঠে, নিয়মিত কাজ করিতে যায়। কাজ করিতে করিতে তার মনে হয়, টাকা রোজগার করা কি

কষ্টকর ব্যাপার! কাজের উপর বিতৃষ্ণা তার ছিল চিরদিনই, এখন মনে হয়, খাটুনি যেন বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ এত খাটিতে পারে? এতকাল মাস গেলে বেতনের টাকাটা হাতে পাইয়া সে বড় খুসী হইত, আজকাল ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবে, ত্রিশ একত্রিশ দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রমের বিনিময়ে মোটে এই কটা টাকা! সহজে টাকা রোজগার করার কি কোন উপায় নাই, সেদিন রাত্রে কিছুক্ষণ শুধু বক বক করিয়া যেমন দশ দশটা টাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছিল?

ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হয়, দয়ালু লোক কি জগতে সেই একজনই ছিল, আর নাই সহরের এই লাখ লাখ লোকের মধ্যে? মর্ম্মস্পর্শী করিয়া দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সে কি একেবারই বলিতে পারিয়াছিল, আর পারিবে না? জনহীন প্রান্তরের সেই বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি হয় তো জুটিবে না, পথ চলিতে চলিতে একজনকে অতক্ষণ ধরিয়া দুঃখের কাহিনী শোনানো যাইবে না, একেবারে দশটাকা দান করিয়া বসার মত উদারতাও হয়তো কারও জাগিবে না, তবু যেমন অবস্থায় যতটুকু শোনানো যায় আর যতটুকু উদারতা জাগানোর ফলে যা পাওয়া যায়?

কাজের শেষে একদিন বাড়ী ফেরার সময় সিল্কের পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোককে যাদব বলিয়া বসে, 'দেখুন, আমি বড় বিপদে পড়েছি—'

এক নজর চাহিয়াই সিল্কের পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক সিগারেট টানিতে টানিতে জোরে হাঁটিয়া আগাইয়া যায়। রাগে দুঃখে অপমানে যাদবের গা'টা যেন জ্বালা করিতে থাকে। গভীর হতাশাতেও তার মনটা ভরিয়া যায়। একটু দাঁড়াইয়া শুনিল না পর্য্যন্ত সে কি বিপদে পড়িয়াছে, মুখ বাঁকাইয়া গট গট করিয়া চলিয়া গেল!

এই কি মানুষ, এই কি ভদ্রলোক ? আবার সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া হইয়াছে !

কদিন আর সহজ উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করিয়া দেখিবার উৎসাহ যাদবের জাগে না, মুখ ভার করিয়া কাজ করে এবং খোলার বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া বৌকে গালাগালি দেয় আর ছেলেমেয়েগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া পিটায়। এদের আনিয়া খরচ বাড়িয়া গিয়াছে, মারাত্মক রকমের খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। বেতনের টাকায় আর কুলায় না, জমা টাকা হইতে কিছু কিছু খরচ করিতে হয়। কি উপায় হইবে ভাবিতে গিয়া যাদবের মাথা গরম হইয়া উঠে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য বন্ধুর সঙ্গে একটা খোলার ঘরে একটু ফূর্তি করিতে গিয়া সারারাত আর বাড়ীই ফেরে না।

সকালে আর সময় থাকে না বাড়ী যাওয়ার, রাস্তার কলে মুখ-হাত ধুইয়া কোন দোকানে কিছু খাইয়া কাজে চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়া যাদব খোলার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। বস্তির সীমানা পার হইয়া বড় রাস্তায় কিছুদূর আগাইয়া একটা জলের কলের সামনে দাঁড়াইয়াছে, নজরে পড়িল কাছেই-দাঁড়-করানো মোটরে যে লোকটি বসিয়াছিল তার শান্ত কোমল দয়া মাখানো মুখখানা। পকেটে যাদবের পয়সা ছিল মোটে পাঁচটা। এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার তার হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, এক পয়সার বিড়ি কিনিলে বাকী থাকিবে মোটে চারিটি পয়সা, চার পয়সায় কি সে খাইবে আর কি খাইয়া সারাদিন খাটিবে ?

মোটরের কাছে গিয়া সে বলে, ‘আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।’

আরোহী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে।—‘কি কথা ?’

'আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমার বড় ছেলের কাল থেকে কলেরা। ওষুধ কিনবার পয়সা নেই—আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।'

'আঁ? সাহায্য?' বিব্রত ও বিরক্ত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগটা বাহির করেন। প্রথমে একটা সিকি বাহির করিয়া যাদবের দিকে একবার তাকান। সমস্ত রাত ফূর্তি করার ফলে মুখখানা যাদবের এমনি শুকনো দেখাইতেছিল যে সিকিটা বদলাইয়া গোটা একটা আধুলি তাকে দান করিয়া বসেন।

কোথায় দশ টাকা, কোথায় আট আনা! একজন না চাহিতেই দিয়াছিল, তারপর দুজনের কাছে সে চাহিয়াছে। একজন কিছুই দেয় নাই, একজন একটি আধুলি দিয়াছে।

কিন্তু যাদব ভাবে, একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে তাই বা মন্দ কি? চাহিতে তো আর পরিশ্রম নাই; দুজনের মধ্যে যদি একজন দেয়, দশজনের মধ্যে দিবে পাঁচজন—পাঁচ আধুলিতে আড়াই টাকা। কুড়ি জনের কাছে চাহিলে পাঁচ টাকা, চল্লিশ জনের কাছে চাহিলে—

যাদব বুঝিতে পারিয়াছে, তার উস্কোখুস্কো চুল আর রুক্ষ চেহারা দেখিয়া মোটরের আরোহীটির দয়া হইয়াছিল। তাই মুখ-হাত সে আর ধোয় না, ফুটপাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথচারীদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখিয়া মনে হয়, মোটরের লোকটির চেয়েও মুখে যেন তার দয়ার ভাবটা বেশী ফুটিয়া আছে। ভদ্রলোককে দাঁড় করাইয়া যাদব সবে তার ছেলের কলেরার ভণিতা আরম্ভ করিয়াছে, তিনি এমন চটিয়া গেলেন, বলিবার নয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, তোমার ছেলের কলেরা, মেয়ের বসন্ত, বৌয়ের টাইফয়েড—ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, লজ্জা করে না তোমার?'

একটা পয়সা বাহির করিয়া যাদবের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া তিনি চলিয়া যান, যাদব থ' বনিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনে তার সত্যই বড় আঘাত লাগিয়াছে। অনেকদিন হইতেই কেমন একটা বিশ্বাস তার মনে জমা করা আছে যে মানুষের দয়া আর সহানুভূতির উপর তার জন্মগত অধিকার। এই অধিকারের দাবীতে সাহায্য আর সহানুভূতি সে চাহিয়াছে অনেকবার এবং অনেকের কাছে। আত্মীয়ের কাছে সাহায্য আর সহানুভূতি না পাইয়া তার যেমন অপমান বোধ হইত, এখন এই লোকটির ব্যবহারে নিজেকে তার চেয়েও বেশী অপমানিত মনে হইতে থাকে। তার কথায় বিশ্বাস না হোক, তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা না হোক, এভাবে খোঁচা দিয়া একটা পয়সা গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া অপমান করার কি দরকার ছিল? একটা টাকা, বড় জোর একটা আধুলি ছুঁড়িয়া মারিলেও বরং কথা ছিল। কি অভদ্র মানুষটা, কি নিষ্ঠুর!

'আপনার ছেলের কলেরা হয়েছে?'

যাদব চাহিয়া দ্যাখে, মাঝবয়সী একটি লোক, মুখে সাতদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরণেও সাবান-কাচা মোটা কাপড়ের সার্ট, আধময়লা পায়ে ছেঁড়া তালি মারা পাম্পস্থ। ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে দেখিয়াও যাদবের বিশেষ ভরসা হয় না, এ রকম লোকের কাছে কি আশা করা যায়, এরকম লোককে দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া লাভ কি! মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া সে আগাইয়া যায়।

লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলে, 'আমার মেজো মেয়েটা আর রোব্‌বার কলেরায় কাবার হয়ে গেছে। এ সহরে মানুষ থাকে মশায়, শুধু রোগ, শুধু রোগ!' একটু থামিয়া সে নিজের শোক সামলাইয়া নেয়, তারপর বলে, 'সঙ্গে তো আমার কিছু

নেই বিশেষ, সঙ্গে যদি একটু আসেন আমার বাড়ী পর্য্যন্ত, আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য—'

বাড়ী বেশী দূরে নয়, কাছেই একটা গলির মধ্যে। মেজো মেয়ের কলেরায় মরণের বিবরণ দিতে দিতে বাড়ীর কাছে পৌছিয়াই ভদ্রলোক একেবারে কাঁদিয়া ফেলে। চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে যাদবের, সহজ উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করিতে গিয়া প্রত্যেকবার যে সঙ্কোচ আর লজ্জার অনুভূতিটা মনের মধ্যে শুঁয়ো পোকার মত হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে, এবার হঠাৎ যেন সেটা প্রকাণ্ড একটা সাপ হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একবার যাদব ভাবে, ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসার আগে চম্পট দিবে; আরও কতলোকের কাছে সাহায্য পাওয়া যাইবে, নাই বা সে গ্রহণ করিল এই একজনের টাকা, যাচিয়া টাকা দেওয়ার জন্য যে তাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী নিয়া আসিয়াছে, ক'দিন আগে যার মেয়েটা মারা গিয়াছে কলেরায়?

ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিয়া পাঁচটি টাকা যাদবের হাতে দেয়।

'আর নেই ভাই, সত্যি নেই। থাকলে দিতাম, সত্যি দিতাম।'

যাদবের ছেলের কলেরার চিকিৎসায় আরও কিছু সাহায্য করিতে না পারিয়া ভদ্রলোকের লজ্জা ও দুঃখের যেন সীমা থাকে না।

এমনিভাবে যাদব রোজগারের সহজ উপায়টি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে থাকে। চুলে সে তেল দেয় না, আঁচড়ায়ও না। কাজ হইতে বাড়ী ফিরিয়াই ছেঁড়া কাপড় জামা পরিয়া, ছেঁড়া একটি জুতা পায়ে দিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। আজ সহরের এ অঞ্চলে, কাল সহরের ও অঞ্চলে বাছা বাছা মানুষকে নিজের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনাইবার চেষ্টা করে। কেউ শোনে, কেউ শোনেনা,

কেউ সহানুভূতি জানায়, কেউ ধমক দেয়, কেউ কিছুই দেয় না। একদিন একজন একটা পয়সা গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া যাদবের অপমান বোধ হইয়াছিল, এখন অনেকেই সেভাবে একটা পয়সা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দেয়—কেউ কেউ একটা আধলাও দেয়! যাদবের কিন্তু আর দুঃখও হয় না, অপমানও সে বোধ করে না। মাঝে মাঝে আনি, দুয়ানী, সিকি পাওয়া যায়, কদাচিৎ টাকা আধুলিও আসে। তাতেই সে খুসী। তা ছাড়া, কয়েকদিনের রোজগারের হিসাব করিয়া সে দেখিতে পায়, একটি একটি করিয়া যে পয়সা পাওয়া যায়, একত্র করিলে সেগুলি আনী দুয়ানী সিকি আধুলি টাকার চেয়ে অনেক বেশীই দাঁড়ায়!

কাজটা সে এখনো ছাড়ে নাই, আর কিছু রোজগার বাড়িলেই ছাড়িয়া দিবে, ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজের জন্য যে সময়টা নষ্ট হয় সেটা দুঃখের কাহিন শোনানোর কাজে লাগাইলে হয়তো রোজগার বেশীই হয়, তবু উপার্জনের নতুন উপায়টি আরও একটু ভালভাবে আয়ত্ত না করিয়া কাজটা ছাড়িয়া দেওয়ার সাহস তার হয় না।

আগে যাদব হাঁটিয়াই যাতায়াত করিত। আজকাল সময় বাঁচানোর জন্য ট্রামে চাপে। একদিন কাজ সারিয়া বাড়ী ফেরার জন্য ট্রামের অপেক্ষা করার সময় অদূরে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা, চাদর কাঁধে, ছড়ি হাতে বিশিষ্ট চেহারার এক ভদ্রলোককে দেখিয়া সে ভাবিতেছে, লোকটিকে দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া দিবে কি না, সে নিজেই ধীরে ধীরে কাছে আগাইয়া আসিল।

'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

চেহারায়, পোষাকে, চলনে, কথায় সবদিক দিয়াই লোকটিকে

এত বেশী সম্ভ্রান্ত মনে হইতেছিল যে, ভূমিকা শুনিয়াও যাদব কিছু বুঝিতে পারে না, সবিনয়ে বলে, 'আজ্ঞে বলুন না।'

লোকটি মৃদু একটু হাসে, 'বলতে এমন লজ্জা বোধ হচ্ছে মশাই। আমি থাকি শেওড়াফুলিতে, একটু দরকারে আজ কলকাতা এসেছিলাম। দোকানে কয়েকটা জিনিব কিনতে যাচ্ছি, কোন ফাঁকে কখন যে কে পকেট কেটে মণিব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে, টেরও পাই নি।'—পাঞ্জাবীর ডানদিকের পকেটটা তুলিয়া দেখায়, সত্যই পকেটটা কাঁচি দিয়া কাটা।

'রিটার্ন টিকিটটা পর্য্যন্ত সে ব্যাগের মধ্যে ছিল। মহা মুস্কিলে পড়েছি, কাউকে চিনি না সহরে, কি করে যে এখন টিকিটের দামটা—'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে যাদব তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, যে ভাবে জুনিয়র উকীল হাঁ করিয়া শোনে বিখ্যাত আইনজীবির বক্তৃতা।

পূজা কমিটী

সহরে জমির বড় দাম। সহরে জমি কিনিয়া বাড়ী করিবার ক্ষমতা যাদের নাই, কিন্তু সাধ আছে, কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যেও জমি কিনিয়া বাড়ী করিবার ক্ষমতা যাদের নেই কিন্তু সাধ আছে, তারাই অগত্যা এখানে জমি কিনিয়া বাড়ী করিতেছে। কয়েক বছর আগে এ অঞ্চলটি ছিল সহরের গা-ঘেঁষা পাড়াগাঁ, সম্প্রতি দুটি একটি করিয়া বাড়ী উঠিতে উঠিতে এলোমেলো কয়েকটি পাড়া গড়িয়া উঠিতেছে। কোন বাড়ীর মালিক ভোগ করিতেছেন পেন্সন, কোন বাড়ীর মালিক ভরসা করিতেছেন পেন্সনের, কোন বাড়ীর মালিক ওসব ভরসা ছাড়াই দিব্যি চাকরী করিতেছেন।

মহামহেশ্বরীপুর পাড়াটিতে বাড়ী আছে গোটা পনের, তার মধ্যে গোটা পাঁচেক বাড়ীকে দোতলা বলা চলে—দুটি বাড়ীর ছাদে ঘরের মত কিছু একটা তোলা হইয়া থাকিলেও কোনমতেই দোতলা বাড়ীর পর্য্যায়ে ফেলিতে ইচ্ছা হয় না। এই সব বাড়ীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মালিকেরা মিলিয়া কয়েক বছর আগে একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—মহামহেশ্বরীপুর দুর্গাপূজা কমিটী। কমিটীর উদ্যোগে কয়েক বছর পাড়ায় পূজা হইয়াছে।

এ বছর পূজার মাসখানেক আগে ছুটির দিন দেখিয়া মনোহর বাবুর বাড়ীর সামনে প্রশস্ত লনে কমিটীর মিটিং আহ্বান করা হইল। ছ'টায় মিটিং বসিবে। মনোহর বাবুর ছেলেরা নিজেদের আর তিনজন প্রতিবেশীর বাড়ীর চেয়ার বেঞ্চি সংগ্রহ করিয়া মিটিং-এর আয়োজন করিল—প্রেসিডেন্টের জন্য রাখা হইল একটি সোফা আর সোফার

সামনে ছোট একটি গোল টেবিল। টেবিলটি ঢাকিয়া দেওয়া হইল অত্যাশ্চর্য ফুল আর লতাপাতা আঁকা সাদা কাপড়ের একটি টেবিল-ক্লথে। মিটিং বসিলে কারও দৃষ্টী যদি লনের প্রান্তের আসল ফুল ও লতাপাতার বদলে কাপড়ের এই সূচীকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয় আর কেউ যদি একটু প্রশংসা করেন, স্ত্রীর বাহাদুরীতে একজনের বুক ফুলিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই এবং রাত্রে প্রশংসার বিবরণ দাখিল করিয়া স্ত্রীর বুকটিও ফুলাইয়া দিয়া স্ত্রীকে সে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী আদর করিবে সন্দেহ নাই।

সাড়ে ছ'টার সময় দেখা গেল সভাস্থলে মোটে জন পাচেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন। সকলেই জানেন যে সকলের আসিতে সাতটা সাড়ে সাতটা বাজিয়া যাইবে। তাছাড়া, পাড়ার পূজা বটে, কিন্তু সেজন্য মাথা ব্যথা হওয়া উচিত পূজা কমিটীর মেম্বারদের। সময়মত সভায় হাজির হওয়ার জন্য কারও তাড়া নাই। যারা আসিয়াছেন, তাঁরা সকলেই পূজা কমিটীর মেম্বারই বটে। অন্য সকলের প্রতীক্ষা করিতে করিতে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে থাকে। ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের মস্তিষ্কের মূল্য যাচাই করা। আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও খুঁত থাকে না। ইউরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা কেন আর সম্ভব নয় নির্ণয় করিয়া দিতে গগনবাবুর তিন মিনিট সময় লাগিল কিনা সন্দেহ। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান পাগল হইয়া গেলেন দেড় মিনিটে।

গগনবাবু কমিটীর প্রেসিডেণ্ট—এক বছর প্রেসিডেণ্টত্ব করিয়াছেন। আজ নূতন বছরের জন্য নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইবে। গগন বাবুর আর একবার নির্বাচিত হইবার আশা আছে। না হইবার

আশঙ্কাও একটু আছে। পাড়ার যে প্রান্তে গগন বাবুর বাড়ী তার বিপরীত প্রান্তের নরেশ বাবুকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন না করায় এই প্রান্তের অধিবাসীদের উপর ঐ প্রান্তের অধিবাসীদের একটু রাগ হইয়াছিল। তবে সকলেই জানে যে নরেশ বাবু গগন বাবুর মত কাজের লোক নন, গগন বাবুর মত তিনি কথায় আসর মাৎ করিতেও পারেন না, লোকের মন ভিজাইয়া কাজ আদায় করিবার কৌশলও জানেন না, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার তেমন পটুতাও তাঁর নাই। নরেশ বাবুর ধন-মান, বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি হইতে পারে, কিন্তু ওসব দিয়া তো সার্বজনীন দুর্গোৎসব হয় না! হয়তো হয়, বড় বড় ব্যাপার পরিচালনা করিতে নরেশ বাবুর মত মানুষকেই হয়তো দরকার হয়, যেখানে খুটিনাটি বিষয় লইয়া পরিচালককে মাথা ঘামাইতে হয় না। কিন্তু যেখানে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলকে সভায় যাওয়ার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিতে হয়! একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াই কাজটা করা যায় বটে, তবু তাও তো বাড়ী বাড়ী ঘোরা? পাড়ার ছেলেদের তোষামোদ করিয়া চাঁদা আদায় করিতে পাঠাইতে হয়, পূজামণ্ডপ তুলিবার সময় হইতে প্রতিমা বিসর্জনের পর পূজামণ্ডপ নামাইবার সময় পর্যন্ত বার বার আসিয়া কর্ত্তালি করিয়া যাইতে হয়, সেখানে নরেশবাবুকে দিয়া কাজ চলে না।

যতীনবাবু বলিলেন, 'কেউ তো আসছেন না।' যতীনবাবুকে গতবার সম্পাদক করা হইয়াছিল। পূজার সমস্ত কাজ একরকম তিনিই করিয়াছেন। সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট নির্দ্দেশ ও উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কাজ হওয়ার সময় নিজে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহিত করিতেও ভুলেন নাই, কিন্তু কাজ সব করিতে হইয়াছে সম্পাদককে। মণ্ডপ বাঁধা, প্রতিমা আনা, পুরোহিত, ঢুলি, চাকর ঠিক করা, বাজার

করা, টাকা পয়সার হিসাব রাখা সমস্ত দায়িত্ব-সম্পাদকের। যতীনবাবু একটু সরল গোবেচারী মানুষ, সামান্য বেতনে চাকরী করেন এবং বিনয়ে সব সময় সকলের কাছে অবনত হইয়া থাকেন—গত বারের মিটিং-এ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়ায় প্রথমটা এত বড় সম্মান লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন। তারপর অবশ্য টের পাইয়াছিলেন সম্পাদক হওয়ার মজা।

গগনবাবু বলিলেন, 'বাঙালীর সময় জ্ঞান তো!' বলিয়া যেন মস্ত একটা রসিকতা করিয়াছেল এমনিভাবে হাসিলেন।

বিকাশ বলিল, 'সময় জ্ঞান আছে বলেই তো ওঁদের আসতে দেরী হচ্ছে।'

জাতি হিসাবে বাঙালী তথা ভারতীয়দের যে সব জাতিগত দোষ বিদেশীয়ের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনায় আবিষ্কৃত, প্রমাণিত, স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়া পুরানো হইয়া গিয়াছে, গগনবাবুর মন্তব্যে সেইগুলি কাজে লাগে। নূতন যুগের নূতন যুক্তির বিচারে ওই সব দোষের কোন্‌গুলির খণ্ডন হইয়াছে, কোন্‌গুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে, রোগের জীবাণু সরবরাহকারী জীবের মত কোন্ কারণের ঘাড়ে চাপিয়া কোন্ দোষ কিসের উপর গিয়া পড়িয়াছে, এসব খবর গগনবাবু রাখেন না। বিকাশের কথাটা না বুঝিয়া তিনি তাই তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'একবার ডাক দিয়ে আসুন না সকলকে।'

বিকাশ সংবাদপত্রে চাকরী করে, বয়স খুব কম, সাতাশ আটাশের বেশি নয়। রোগা চেহারা, মুখে গভীর শ্রান্তির সঙ্গে নির্বিকার উদাস ভাব মিশিয়া আছে, চোখ দু'টি যেন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভারে ভারাক্রান্ত। পাড়ার কারও বাড়ীতে তার বিশেষ যাতায়াত নাই, পাড়ার ব্যাপারে মাথাও সে বেশি ঘামায় না, সার্বজনীন দুর্গোৎসবের

মত ব্যাপারেও দুটি টাকা চাঁদা দিয়াই সে তার কর্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করে। পূজার ক'দিন পূজা-মণ্ডপে যখন পাড়ার অধিকাংশ লোকই অন্তত দিনের অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দেয়, বিকাশকে দশ পনের মিনিটের বেশী সেখানে দেখা যায় না। পাড়ার প্রত্যেকের মনে হয়, সকলকে সে যেন মনে মনে একটু অবজ্ঞা করে। পাড়ার সকলেই তাই মনে মনে তাকে একটু অবজ্ঞা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে পড়িলে অবজ্ঞা করার বদলে সকলেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে, বিকাশের দৃষ্টিপাতে বুদ্ধিটা সঙ্গে সঙ্গে একটু তীক্ষ্ণ হইয়া যাওয়ায় যেন অনুভব করিতে পারে যে, অবজ্ঞার প্রতিবাদে রাগ করিয়া বিকাশকে অবজ্ঞা করিতে চাহিয়া বিকাশের কাছে সকলে তারা যেন ছোট হইয়া গিয়াছেন!

যারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই প্রবীণ। নতুবা সকলকে ডাক দিয়া আসিবার জন্য বিকাশকে অনুরোধ করিতে গগনবাবুর হয় তো সাহস হইত না। এতগুলি প্রবীণ লোকের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বিকাশকে কিছু করিতে বলা যেন সহজ হইয়া গিয়াছিল।

বিকাশ কিন্তু উদাসভাবে হাই তুলিয়া শুধু বলিল, 'হ্যাঁ, আবার ডাকতে হবে সবাইকে। না আসেন নাই আসবেন।'

মনে মনে সকলে রাগ করিলেন, গগনবাবুও। কিন্তু বিকাশের ছেলেমানুষীতে যেন আমোদ পাইয়াছেন, এমনিভাবে হাসিয়া গগনবাবু বলিলেন, 'রাগ করলে কি চলে বিকাশবাবু! তাহলে কি কাজ হয়? মানিয়ে নিতে হয়—উপায় যখন নেই, মানিয়ে নিতে হয়। আমরা যারা এসেছি যদি রাগ করে এখন যে যার বাড়ী চলে যাই, পূজো হবে কি করে?'

বিকাশ বলিল, 'নাইবা হল?'

সাড়ে সাতটার সময় মিটিং আরম্ভ হইল। ততক্ষণে আরও জন আষ্টেক লোক আসিয়াছে। তিন জনের না আসিলেও ক্ষতি ছিল না, তারা কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা মাত্র। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে লনের জন্য বাড়ীর দেয়ালে যে আলোটি বসানো আছে সেটি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাল্‌বটি কম পাওয়ারের, মিটিং-এ ভাল আলো হয় নাই। বিকাশ বসিবার ঘরে গিয়া মিটিং করার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু বসিবার ঘরের বসিবার ব্যবস্থা লনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া তার প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া গিয়াছে। মেঝেতে মাদুর ও সতরঞ্চি পাতিয়া চোখের পলকে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলা সম্ভব বটে, কিন্তু মাদুর আর সতরঞ্চিতে বসিয়া কি মিটিং হয়! এতগুলি মান্যগণ্য ভদ্রলোককে মাদুর আর সতরঞ্চিতে বসিয়া মিটিং করিতে বলায় সকলে আবার বিকাশের উপর রাগ করিয়াছেন। গগনবাবুর নির্দেশ মত চাকর পাঠাইয়া একটি গ্যাসের আলো আনাইয়া লওয়া হইয়াছে। বিদ্যুতের আলো মৃদুভাবে রঙীন, গ্যাসের আলো তীব্রভাবে সাদা—দু'রকম আলোর সঙ্গে আবছা চাঁদের আলো মিশিয়া সভায় এক আশ্চর্য্য আলোর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এটা কেউ লক্ষ্য করিয়াছে কিনা সন্দেহ। বিকাশ সকলের দিকে তাকায়। কিশোর, যুবক, মাঝবয়সী, প্রৌঢ়, প্রবীন ও বৃদ্ধ সব রকম মানুষ দু'একজন করিয়া আসিয়াছে, কারও কি চোখ নাই? এক মিনিটের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া আলোর এই কৌতুককর সমন্বয়টা খেয়াল করিবার মত মন কি একজনেরও নয়?

সকলেই পরিষ্কার জামা কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, বয়স্কদের সকলের হাতেই প্রায় ছড়ি অথবা লাঠি। মিটিং-এ আসিতে অনেকে দেরী করিলেও এবং পাড়ার সাধারণ বৈকালিক আসরের মত নিজেদের

মধ্যে সাধারণ গল্পগুজব চালাইতে থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় নিজের নিজের গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। সকলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া বিকাশের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। পাড়ার এক ভদ্রলোকের বাড়ীর লনে পাড়ার লোকের সভা না হইয়া গড়ের মাঠে সর্বসাধারণের সভা হইলে ভিড়ের মধ্যে ছেঁড়া-ময়লা জামা কাপড় পরিয়াও নির্বিবাদে সকলে বসিয়া থাকিতে পারিতেন, এ-রকম মৃদু চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ও অস্বস্তির ভাব কারও মধ্যে দেখা যাইত না। ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে এরা সকলেই তুচ্ছ, দশজনের একজন মাত্র। কিন্তু এখানে প্রত্যেকেই যেন এক একজন লাটসায়েব। ভিখারী সত্যসত্যই নিজের ভাঙ্গা কুটীরের রাজা।

গগনবাবু প্রস্তাব করিলেন যে, কেদারবাবুকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া সভার কাজ আরম্ভ করা হোক। কেদারবাবুর বয়স প্রায় ষাট—মদ, গাঁজা, আফিম সংক্রান্ত সরকারী কাজে জীবন কাটাইয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোকের কেমন একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, তিনি আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ ও নারীই নেশাখোর। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার প্রস্তাবে ভিতরে ভিতরে পুলকিত হইয়াছেন, স্পষ্টই বুঝা গেল, মুখে তবু প্রতিবাদ করিতে ছাড়িলেন না—'আহা, আহা, আমাকে কেন, আমাকে কেন। এত সব যোগ্য ব্যক্তি থাকতে এত বড় দায়িত্ব—আমি বুড়ো মানুষ—'

গগনবাবু ভরসা দিয়া বলিলেন, 'এতো আমাদের ঘরোয়া মিটিং কেদারবাবু, আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু আপনার নামটা থাকবে, মিটিং-এ আপনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।'

কেদারবাবু বলিলেন, 'ও, শুধু মিটিং-এর প্রেসিডেণ্ট।'

মুখের চামড়া একটু ঢিল হইয়া আসিয়াছে, রেখাগুলি স্পষ্টই চোখে

পড়ে, তবু কেদারবাবু এখনও সযত্নে দাড়ি গোঁফ কামান। বিকাশের মনে হয়, গগনবাবুর প্রস্তাব শুনিয়া তাঁর মুখের চামড়া একটু টান হইয়া পুলকের জ্যোতিতে যেন চক্‌চকে দেখাইতেছিল, এক বছরের জন্য তাঁকে পূজা কমিটীর স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট করা হইতেছে না শুনিবামাত্র আবার যেন তাঁর মুখের চামড়া আলগা ও নষ্টপ্রভ হইয়া গেল। সভার কাজ আরম্ভ হইয়া যায়, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্পাদক যতীনবাবু গত বছরের পূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন ; বিকাশ ভাবিতে থাকে যে, মানুষ বোধ হয় জীবনে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই সঞ্চয় করে না, সাত বছরেব তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা ষাট বছরে শুধু ভোঁতা হইয়া আসে, খেলনা ছিনাইয়া লইলে সাত বছরের আর্তক্রন্দন ষাট বছরের মুখ ম্লান হওয়ায় পরিণত হয়।

যতীনবাবু রিপোর্টটি লিখিয়াছেন ইংরাজীতে—বোধ হয় কাউকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছেন। ঠেকিয়া ঠেকিয়া, ঢোঁক গিলিয়া, শব্দের ভুল উচ্চারণ করিয়া তিনি প্রেসিডেণ্ট ও পৃষ্ঠপোষকদের ধন্যবাদ জানান, বলেন যে, সকলের সাহায্য পাইয়া অক্ষম ও অকর্মণ্য হইয়াও কোন রকমে তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বলিতে বলিতে বিনয় ও দীনভাবের আতিশয্যে যতীনবাবু যেন গলিয়া যাইবেন মনে হয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে সবিনয়ে মিথ্যা কথাগুলি বলিবার সুযোগ যে তিনি পাইয়াছেন, শুধু এই গর্ব্বেই মুখখানা তাঁর উজ্জ্বল হইয়া গ্যাসের আলোটার সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চায়। বিকাশের মনে পড়ে, পূজার কাজের নামে পাড়ার ছেলেবুড়ার যখন পাত্তা মিলিত না, একদিকে অফিস করিয়া অন্যদিকে পূজার কাজে ছুটাছুটি করিয়া যতীনবাবু যখন প্রায় পাগল হইয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছিলেন, বিকাশের কাছেই কি তীব্র জ্বালার সঙ্গে নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি পাড়ার

সকলের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতেন! পূজা কাটিয়া যাওয়ার কয়েকমাস পরেও যতীনবাবুর জ্বালা কমে নাই, মাঝে মাঝে নিজেই কথা তুলিয়া বিকাশের কাছে মনের ঝাঁঝ প্রকাশ করিতেন এবং বারংবার প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, কোন্ শালা আর পূজা কমিটীর সম্পাদক হয়। বিকাশ আশা করিতেছিল, রিপোর্টে কার্য্য নির্বাহের ব্যবস্থা ও সংগঠনের ত্রুটির কথাটা অন্তত ইঙ্গিতেও যতীনবাবু উল্লেখ করিবেন, কিন্তু নিজের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাহিয়া যতীনবাবু রিপোর্ট শেষ করিলেন। বিকাশের মনে হইল, আজ যদি সভায় যতীনবাবুকে আবার সম্পাদক করিবার প্রস্তাব করা হয়, কোন অভিযোগ না করিয়া বর্তমান ব্যবস্থার কোনরকম সংস্কার বা পরিবর্তন দাবী না করিয়া, যতীনবাবু হয় তো রাজী হইয়া যাইবেন!

ধপ করিয়া পাশে বসিয়া পড়িয়া যতীনবাবু প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন হয়েছে?’

বিকাশ সংক্ষেপে বলিল, ‘বেশ।’

সোজাসুজি করুণা ও অবজ্ঞার ভাব মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা বিকাশের হয় না, তার নিজের মেরুদণ্ডও শক্ত নয়। নূতন যুগের নূতন চিন্তার কতগুলি খোসা কুড়াইয়া গিলিয়া ফেলার ফলে তার শুধু বদ-হজম হইয়াছে। অন্যের দুর্বলতায় সে তাই কেবল বিদ্বেষ অনুভব করে।

কেদারবাবু মিটিং-এর প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, আসলে সভাপতিত্ব কিন্তু করিতেছিলেন গগনবাবু। তিনিই সকলকে সম্পাদকের রিপোর্ট অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিলেন, সম্পাদকের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলেন—কি কায়দাদুরস্ত তার ভাষা, কত বড় বড় শব্দের ফোড়ন তাতে! আত্মপ্রত্যয়ের আতিশয্যে ভদ্রলোকের

মেরুদণ্ডটা হাতের লাঠিটির মত সিধা হইয়া গিয়াছে, লাঠির ডগায় ডান হাতের তালুর উপর বাঁ হাতের তালু স্থাপন করিয়া তিনি বসিয়াছেন। মুখে কিন্তু ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই, শুধু গভীর বিনয় ও অমায়িকতার ছাপ। প্রথম হইতে বিকাশ তার মধ্যে আজ অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, সকলকে আজ তিনি জয় করিতে চান। আবার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবার জন্য ভদ্রলোক যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু অসংযত হইয়া পড়েন নাই, এই বড় আশ্চর্য্য। বিকাশ জানে, কাল তার মধ্যে এই প্রাণশক্তির চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না! কিন্তু কি আসিয়া যায় তাতে? সকলেই তো সমান— গগনবাবুর মধ্যে তবু একটি সন্ধ্যার জন্যও অন্তত একটু জীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, গগনবাবুর জন্যই বিকাশ নিজেও একটু উৎসাহ বোধ করিতেছিল, অন্য সকলের মধ্যেও তিনি যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন, তাও সে অনুভব করিতে পারিতেছিল। এতটুকু পাড়ার সামান্য পূজা, ছোট দেখিয়া সস্তায় প্রতিমা কিনিতে হয়, একটির বেশি ঢোলে কাঠি পড়ে না, ভিক্ষা করা বিদ্যুতের আলোয় পূজা মণ্ডপ উজ্জ্বল হয় না। এই সামান্য কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া মিটিং, পূজা কমিটী গঠন প্রভৃতির অভিনয় করা—কেউ ভুলিয়াও ভুলিতে পারে না যে, ব্যাপারটা ছেলেখেলার মতই তুচ্ছ বটে। গগনবাবু যেন সকলের মন হইতে এ ভাবটা এখনকার মত মুছিয়া দিয়াছেন, সকলে যেন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পাড়ার পূজার ব্যাপারটা সত্যই বড় গুরুতর ব্যাপার।

সামনের রাস্তা দিয়া দামী একটি গাড়ী আগাইয়া গিয়া পাশের বাড়ীর সামনে দাঁড়ায়, দুজন পুরুষ, একজন মাঝবয়সী মহিলা ও দু'টি তরুণী

নামিয়া এ বাড়ীর লনে ক্ষুদ্র সভার দিকে চাহিতে চাহিতে ভিতরে যায়। বিকাশ বুঝিতে পারে, মিঃ দাস সপরিবারে মিঃ দে'র বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন। মিঃ দে পাড়ার মধ্যে কালচারের রাজা। ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়ে, টেনিস খেলে, সাজগোজ করে, গোল হইয়া বসিয়া সকলে মিলিয়া চা খায়, মিহি সুরে কথা বলে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা করে, পাড়ার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে না। মিঃ দে মিটিং-এ যোগ দেন নাই। তবে তিনি বরাবর পাচ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন।

অবস্থা ও চেহারা যেমন হোক, কাপড়জামা, চালচলন ও কথায় একটু মার্জিত রুচির পরিচয় দিতে পারে বলিয়া মিঃ দে'র বাড়ীতে বিকাশ একটু আমল পায়। মিঃ দাসের পরিবারের সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। সভা ছাড়িয়া পাশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বিকাশের মনটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া ওঠে! এই পারিপার্শ্বিকতা আর ভাল লাগিতেছে না, এতগুলি মানুষ অভিনয় করিতেছে, প্রাণের অভিনয় করিতে পারে না কেন? তরুণ তিন জন পর্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। এই কি শারদোৎসবের, বাঙালীর সবচেয়ে বড় উৎসবের ভূমিকা?

হঠাৎ গগনবাবুর দিকে চোখ পড়ায় বিকাশ অবাক হইয়া যায়। মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে গগনবাবুর, মুখ প্রায় নামিয়া আসিয়াছে দু'হাতে চাপিয়া ধরা লাঠির হাতলের কাছাকাছি,—নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন মুখ। হঠাৎ কি হইল গগনবাবুর?

সুরেশবাবু বলিতেছিলেন, 'তা'হলে এই ভাবে প্রস্তাব করা হোক। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পুনরায় আমাদের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু তিনি অসম্মত হওয়ায়—'

‘ঠিক অসম্মত নয়। মানে—’ গগনবাবুর গলাটা বিকাশের বড়ই খাপছাড়া মনে হইল।

‘আচ্ছা তা’হলে অন্তভাবে করা হোক।......কিন্তু তিনি প্রতিবৎসর নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা সঙ্গত মনে করায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হইল। কি বলেন আপনারা ?’

নিস্তেজ মানুষগুলির মধ্যে এতক্ষণের চেষ্টায় গগনবাবু যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই উৎসাহের বশে সকলে সোল্লাসে সায় দিলেন। মিঃ দে’র বাড়ীতে মৃদু কোমল কণ্ঠে কে যেন গান আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় মিঃ দে’র সেজো মেয়ে। অথবা রেডিও বাজিতেছে। গগনবাবুর মুখ দেখিয়া বিকাশের মনের স্বাভাবিক অকারণ জ্বালা-বোধ এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে অফুরন্ত নালিশ মিলাইয়া যায়, সে এমন একটা রসালো আমোদ বোধ করে, বলিবার নয়। মনের সমস্ত ক্ষত যেন কৌতুকের মলমে জুড়াইয়া গিয়াছে। একটু বিনয়, অর্থহীন একটু বিনয় করিতে গিয়া গগনবাবুর প্রেসিডেণ্ট হওয়া হাতের মুঠায় আসিয়া ফস্কাইয়া গেল!

আপিম

আজ সকালে বাজারে যাওয়ার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। বাজার প্রতিদিন একরকম নরেন নিজেই করে, আজ সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সে একগাদা অপিসের কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছে। অথচ বাজারে একজনকে পাঠাইতেই হইবে। অপিস আছে, স্কুল-কলেজ আছে, কিছু মাছ-তরকারী না আনাইলে চলিবে কেন? ব্যস্ত ও বিব্রত স্বামীর মুখ দেখিয়া মায়ার বড়ই মমতা বোধ হইল, বাজারের কথাটা না তুলিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল ছাতে।

ছাতের ঘুপচি-ঘরখানায় থাকে বিমল, সংসারের সমস্ত গণ্ডগোলের উর্দ্ধে থাকিয়া সে কলেজের পড়া করে। বিমল তখনও ঘুমাইতেছিল, বেলা আটটার আগে কোনদিনই তার ঘুম ভাঙ্গে না। ছোট কেরোসিন কাঠের টেবিলটিতে গাদা করা বই-খাতা আর ইংরাজী বাংলা মাসিক-পত্র, বিছানাতেও কয়েকটা বই পড়িয়া আছে। মাথার কাছে একটা বার্লির কৌটা দেশলাই-এর কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরা আর ছাই-এ প্রায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিয়া মেঝের যেটুকু ফাঁকা আছে সেখানেও এইসব আবর্জ্জনাই বেশী।

এসব মায়ার নজরে পড়িল না, এতবড় ছেলে সিগারেট খাইবে সেটা আর এমন কি দোষের ব্যাপার? মায়ার শুধু চোখে পড়িল ঘুমন্ত ছেলের ক্লিষ্ট মুখখানি। আহা, কত রাত জাগিয়া না জানি ছেলে তার পড়িয়াছে! আজ যেমন করিয়াই হোক ওকে একটু বেশী দুধ খাওয়াইতেই হইবে। ভাসুরের দুধ যদি একটু কমাইয়া দেওয়া যায়—আপিম খায় বলিয়াই একজন রোজ একবাটী দুধ

খাইবে আর এত খাটিয়া তার ছেলের যথেষ্ট দুধ জুটিবে না? যে ছেলে একদিন—

সেইখানে দাঁড়াইয়া মায়া হয়তো ছেলের ভবিষ্যতের এবং সেই সঙ্গে জড়ানো নিজের ও নিজের এই সংসারের ভবিষ্যতের স্বপ্নে কিছুক্ষণের জন্য বিভোর হইয়া থাকিত, গোঙানির মত আওয়াজ করিয়া বিমল পাশ ফেরায় স্বপ্ন দেখা তখনকার মত স্থগিত রাখিতে হইল।

কাল যে ইংরাজী নভেলটি পড়িতে পড়িতে বিমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক পিঠের নীচে সেই বইখানাই অনেকক্ষণ তার ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করিতেছিল। মায়া ডাকিতেই সে জাগিয়া গেল।

বাজার? চা-টা খাইয়া একবার বাজার যাইতে হইবে? মস্ত একটা হাই তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বিমল বলিল, 'আমি পারব না।'

মায়া তা জানে। বিমল কোনদিন বাজারে যায় না, বাজারে গেলে তার বিশ্রী লাগে, কেমন যেন লাগে, বড় খারাপ লাগে। তবু মায়া আরেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, 'কাকে পাঠাব তবে? আজকের মত একবারটি যা লক্ষ্মী, উনি আপিসের কাজ নিয়ে বসেছেন নইলে—'

বিমল আবার মাথা নাড়িল, 'উঁহুঁ, বাজার-টাজার আমার দ্বারা হবে না মা। বলতো দশবার গিয়ে দোকান থেকে জিনিষ এনে দিচ্ছি, বাজারে ঢুকে মাছ তরকারী কিনতে পারবো না।'

মায়া ফিরিয়া গেল। তাই হোক, কোনদিন যেন ছেলেকে তার নিজে বাজার করিতে যাইতে না হয়, শুধু বাজার করার জন্যই যেন মাহিনা দিয়া লোক রাখিবার ক্ষমতা তার হয়।

আচ্ছা, তার ভাসুর কেন বাজার যায় না? অন্তত আজকের মত কেন যাইবে না? আপিম খায় বলিয়া? এতো উচিত কথা নয়! আগে যখন বড় চাকরী করিত, তখনকার কথা আলাদা, তখন কিছু

বলিবার ছিল না, কিন্তু এখন যখন সপরিবারে ধরিতে গেলে একরকম ভাই-এর ঘাড়ে চাপিয়া আছে, এখন একদিনের জন্য দরকার হইলে কেন সে যাইবে না ?

কথাটা বুঝাইয়া বলিতে নরেনও সায় দিল, তারপর সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'দাদা কি যাবে ? কা'ল কতটা গিলে ঘুমোচ্ছে কে জানে, ডেকে তুলতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। দাদার কথা বাদ দাও।'

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আজকাল।'

নরেন এ কথাতেও সায় দিল। বলিল, 'কি জান, শোকে তাপে এরকম হয়েছেন। বৌদি মারা যাবার পর থেকে—'

'তার আগে বুঝি খেতেন না ?'

'তা খেতেন, তবে সে নামমাত্র, এতটা বাড়েনি।'

'আপিমের নেশা বাড়ালেই বাড়ে।'

মায়া উঠিয়া গেল, বাজারে পাঠাইয়া দিল ঠিকা ঝি কালিদাসীকে। বাড়তি একটা কাজও কালিদাসী করে না, এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিতে বলিলেও গজর গজর করে, কিন্তু বাজারে পাঠাইলেই যায়। পয়সা তো চুরি করেই, মাছ তরকারীও কিছু কিছু সরায়, ভিন্ন একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া নির্ভয়ে মায়াকে দেখায়, অন্তরঙ্গ ভাবে একগাল হাসিয়া বলে, 'ঘরের বাজারটাও এই সাথে সেরে এলাম মা। গরীবের বাজার দেখেছ মা, দুটি আলু, দুটি ঝিঙে—'

মায়া বিশ্বাস করে না যে, তাদের বাজার হইতে সরানো এই সামান্য জিনিষেই কালিদাসীর বাড়ীর সকলের পেট ভরে। তবে সে আরও যে তিনটি বাড়ীতে কাজ করে তাদের প্রত্যেকের বাজারে এরকম ভাগ বসাইলে চলিয়া যাইতে পারে বটে। মাঝ বয়সী এই স্ত্রীলোকটির আঁটসাট গড়ন আর চালচলন সমস্তই মায়ার চক্ষুশূল, ঝি

পাওয়া এত কঠিন না হইলে সে কবে কালিদাসীকে দূর করিয়া দিত। তবু মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের ঘরের খবর না জানিয়া পারে না, তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া কালিদাসীর সংসারের সব বিবরণই মায়া প্রায় জানিয়া ফেলিয়াছে। খাওয়ার লোক এবাড়ীর চেয়ে দু'একজন বেশীই হইবে, তাছাড়া কালিদাসীর স্বামী মদন আপিম খায়।

প্রথম দিন খবরটা শুনিয়া মায়া গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলিয়াছিল, 'আপিম খায়! তাই বুঝি রোজগার পাতি কিছুই করে না?'

কালিদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিল, 'রোজগার করবে না কেনে গা? ওর মত খাটতে পারে কটা লোক? তবে গরীবের রোজগার তো, কুলোয় না।'

মায়াও আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিল, 'আপিম খায়, তবু নিয়মমত কাজকম্মো করে?'

কালিদাসী বলিয়াছিল, 'আপিম খায় তো কাজকম্মো করবে না কেনে মা?'

প্রায় দশটার সময় কালিদাসীর বাজার করা মাছ-তরকারী মুখে গুঁজিয়া নরেন অপিস যাইতেছিল, আপিমখোর দাদা ডাকিতেছে শুনিয়া তার ঘরে গেল। তিনটি মাথার বালিশের উপর একটা পাশ বালিশ চাপাইয়া আরামে ঠেস দিয়া হরেন আধশোয়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। মুখে কিন্তু তার একটুও আরামের ছাপ নাই, আছে চট চটে ঘামের মত ভোঁতা একটা অবসাদ আর নির্বিকার উদাসভাবের আবরণ। তোষকটা একটু ছেঁড়া, বিছানার চাদরটা অত্যন্ত ময়লা, দুটি বালিশ আর পাশ বালিশটিতে ওয়াড়ের অভাব, ঘরের সমস্ত জিনিষপত্রে পীড়াদায়ক বিশৃঙ্খলা। কিন্তু উপায় কি?

শোকে তাপে মানুষ যখন কাতর হইয়া পড়ে, তখন আর তার কাছে কি প্রত্যাশা করা যায় ?

হরেন বলিল, 'আপিস যাচ্ছ ?'

নরেন বলিল, 'হ্যাঁ।'

'একটা টাকা দাও দিকি আমাকে।'

নরেন একটু ভাবিল। টাকার বড় টানাটানি, মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। অনেকদিন হইতে দাদাকে সে টাকা দিয়া আসিতেছে, কখনো একটা, কখনো দশটা। আজ ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। আর কি কোনদিন হরেনের পক্ষে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বড় চাকরী-বাকরী করা সম্ভব হইবে ? আগের মত অত বড় না হোক, মাঝারি রকমের বড় ? দু'বছরের মধ্যে যদি এত আপিম বাড়াইয়াও শোকতাপটা সামলাইয়া উঠিতে না পারিয়া থাকে, আর কি কোনদিন পারিবে ? আপিমটা হয়তো দিন দিন পরিমাণে বাড়িয়াই চলিবে। মায়া ঠিক বলিয়াছে, আপিমের নেশা বাড়াইলেই বাড়ে।

'টাকা তো নেই দাদা। মাস কাবার হয়ে এল, আমি সামান্য মাইনে পাই—'

'একেবারে নেই ? আনা চারেক হবে না ?'

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, একটি পয়সা নেই। আপিমের জন্যে তো ? আপিমটা এবার তুমি ছেড়ে দাও দাদা।'

হরেন তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল, 'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু হঠাৎ তো ছাড়া যায় না, এ্যাদ্দিনের নেশা! কারও কাছে ধার-ধোর করে অল্প একটু এনো আজ :কিনে, কমিয়ে কমিয়ে কদিন বাদেই একেবারে ছেড়ে দেব। সত্যি, এ নেশাটা এবার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। এনো কিন্তু, কেমন ?'

'দেখি'—বলিয়া নরেন চলিয়া গেল।

জবাবটা হরেনের তেমন পছন্দ হইল না। অন্তত আজকের দিনটা চলিয়া যায় এরকম সামান্য পরিমাণে আপিম নরেন কিনিয়া আনিবে এটুকু ভরসাও কি করা চলে, এরকম জবাবের পর? যদি না আনে? অসময়ে সে ফিরিয়া আসিবে, তারপর হয় তো হাজার চেষ্টা করিয়াও এক রতি আপিমও সংগ্রহ করা চলিবে না। কি সর্ব্বনাশ!—সন্ধ্যার সময় একটু আপিম না হইলে তার চলিবে কেন? কথাটা ভাবিতে গিয়াই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বিমল কলেজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলে বিমলকে সে ডাকে, গলা যথাসম্ভব মিহি করিয়া বলে, 'কলেজ যাচ্ছ? তোমার কাছে টাকা আছে, একটা দিতে পার আমায়?'

বিমল বলে, 'আছে, তোমায় দেব না।'

'কেন?'

'আপিম খেয়ে খেয়ে তুমি গোল্লায় যাবে আর আমি—'

হরেনের আধবোজা চোখ দুটি যেন এমন শ্রান্ত যে আড়চোখে ভাইপোর মুখের দিকে তাকানোর পরিশ্রমটুকু করিবার ক্ষমতাও চোখের নাই। চোখ দুটি একেবারে বুজিয়া ফেলিয়া বলে, 'আচ্ছা, থাক থাক। দরকার নেই।'

স্নানাহারের পর হরেন আধ ময়লা একটি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া নিজেই বাহির হইয়া যায়। আপিম ছাড়া তো চলিবে না, যে ভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে।

এদিকে অপিসে কাজ করিতে করিতে নরেনের মনটা খুঁত খুঁত করে। প্রথমটা হরেনের মঙ্গলের জন্য নিজের দৃঢ়তা প্রদর্শনের কথা ভাবিয়া বেশ গর্ব বোধ করিতেছিল, অপিসে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই

প্রায় সে ভাবটা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, মোটে চারগণ্ডা পয়সা চাহিয়াছিল, না দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? একদিনে আপিম ছাড়া আপিমখোরের পক্ষে সম্ভব নয়, একথাও সত্য। মনে কর, হরেন যদি সত্যসত্যই কমাইয়া কমাইয়া ধীরে ধীরে আপিম ছাড়িয়া দেয়, আবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া ভাল একটা কাজ সংগ্রহ করিয়া ফেলে এবং আজকের ব্যাপারের জন্য তাকে কোনদিন ক্ষমা না করে? কোনদিন যদি তাকে আর টাকা পয়সা কিছু না দেয়? কাজে নরেনের ভুল হইয়া যাইতে থাকে। হরেন যখন বড় চাকুরী করিতেছিল তখনকার সেই সুখের দিনগুলির কথা মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে। কি আরামেই তখন সে ছিল! কোন ভাবনা ছিল না, কোন অভাব ছিল না, নিজের বেতনের প্রায় সব টাকাই নিজের সুখের জন্য খরচ করিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। আজ চারিদিকে টানাটানি, কেবল অভাব আর অভিযোগ, দিনে পাঁচটির বেশী সিগারেট খাওয়ার পর্য্যন্ত তার উপায় নাই, বিড়ি টানিতে হয়! আপিমের নেশাটা ছাড়িয়া হরেন যদি আবার......

টিফিনের সময় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, একমাথা ঝাঁকড়া চুল লইয়া মাঝবয়সী একটি লোক আসিয়া বলিল, 'এমাসে নেবেন তো? আপনার জন্যে বাছা বাছা নম্বর রেখেছি—সব কটা জোড় সংখ্যা, একটা বিজোড় নেই। এই দেখুন, চার, আট, ছয়—'

ছ'টি লটারীর টিকিট বাহির করিয়া সে নরেনের হাতে দেয়। নরেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'কিনছি তো প্রত্যেক মাসে, লাগছে কই!'

প্রথমে তিনখানা, তারপর জোড়াসংখ্যার টিকিট কেনা ভাল মনে করিয়া চারিখানা টিকিট রাখিয়া নরেন একটি টাকা বাহির করিয়া দিল।

টাকাটা পকেটে ভরিয়া লোকটি বলিল, 'একটাকা দামের একখানা টিকিট আছে, নেবেন? ফার্ষ্ট প্রাইজ চল্লিশ পার্সেণ্ট, গতবার সাতান্ন হাজার হয়েছিল, এবার আরও বেশী হবে। মস্ত ব্যাপার!'

টিকিটখানা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নানাভাবে দেখিয়া নরেন বলিল, 'নেব কি, টাকাই যে নেই। একেবারে মাসকাবারে এলেন, ক'দিন আগে যদি আসতেন! তেস্‌রা আসবেন, নেব'খন।'

লোকটি ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'তেস্‌রা আসব কি মশায়, আজকে লাষ্ট ডেট। সব টিকিট সেল হয়ে গেছে, ওই একখানা রেখেছিলাম আপনার জন্যে—কি জানেন, এতে আপনার চান্স বেশী, টিকিট লিমিটেড কি না। থার্ড প্রাইজও যদি পান, বিশ হাজার টাকা তো বটেই, বেশীও পেতে পারেন।'

আর একটি টাকা মনিব্যাগে ছিল, টাকাটি নরেন বাহির করিয়া দিল।

এদিকে কলেজে বিমলের মনটাও খুঁত খুঁত করে। হরেন যখন তাকে ডাকিয়াছিল, তার খানিক আগেই কাগজে একজন দেশ-নেতার মস্ত একটা বিবৃতি সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল। বিবৃতিটি অবশ্য আপিম সম্পর্কে নয়, তবু সেটি পড়িয়া দেশশুদ্ধ লোকের উপর যে তীব্র আক্রোশ আর যে অনির্দ্দিষ্ট আত্মগ্লানি তাকে পীড়ন করিতেছিল, অর্দ্ধশায়িত জ্যেঠাকে দেখিয়া তার প্রতিক্রিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট উপলক্ষ পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ-জাগা বেপরোয়া উদ্ধতভাবের আর সীমা ছিল না। কলেজে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই সে ভাবটা প্রায় উবিয়া গিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, ওরকম বাহাদুরী না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কেবল সবিতাদের বাড়ীতে নয়, আরও যে

কয়েকটি উঁচুস্তরের পরিবারে সে মেলামেশার সুযোগ পাইয়াছে, একটু খাতিরও পাইতেছে, তাতো কেবল সে হরেন মিত্রের ভাইপো বলিয়াই! তার জ্যেঠামশায়ের সুদিন যদি কোনদিন ফিরিয়া আসে আর জ্যেঠামশায় যদি তাকে উঁচুস্তরে উঠিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তবেই তো কেবল সবিতার সম্বন্ধে আশা ভরসা পোষণ করা তার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য সবিতা যদি তার জন্য পাগল হইয়া উঠে, যদি বুঝিতে পারে যে তাকে ছাড়া বাঁচিয়া থাকিয়া কোন সুখ নাই, তবে হয়তো জ্যেঠামশায় পিছনে নাই জানিয়াও এবং সে যে একদিন বড় হইবেই হইবে তার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ সে এখন দেখাইতে না পারিলেও, তাকেই সবিতা বরণ করিবে। তবু, জ্যেঠামশায়কে চটানো বোধ হয় উচিত হয় নাই?

তিনটার সময় বিমল গেটের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তার ক্লাশ একঘণ্টা আগেই শেষ হইয়াছে. এবার শেষ হইল সবিতার।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সবিতা আসিল, বিনা ভূমিকাতেই বলিল, 'আজ তো আপনাকে মোড় পর্যান্ত পৌঁছে দিতে পারব না। আমি অন্য দিকে যাব।'

বিমল বলিল, 'কোনদিকে?'

সবিতা বলিল, 'এই—অন্যদিকে। মানে, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব।'

বিমল বলিল, 'কতক্ষণ থাকবেন?'

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তার কি ঠিক আছে কিছু!'

সবিতার গাড়ী চলিয়া গেলে বিমল ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা যায়? একবার সে বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা দামী ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল। হরেন তাকে একদিন ঘড়িটি কিনিয়া দিয়াছিল।

এত শীগগির বাড়ী ফিরিয়া কোন লাভ নাই। মাধুরীদের বাড়ীতে যদি যায়, কেমন হয়? মাধুরী হয় তো দু'একখানা গান শোনাইতে পারে, তারপর হয় তো তার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেও রাজী হইতে পারে। কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাইয়া যাওয়া দরকার, মাধুরী তো শুধু এক কাপ চা খাইতে দিবে।

সেদিন রাত্রি ন'টার সময়ও হরেন বাড়ী ফিরিল না। নরেন আর বিমলকে ভাত দিয়া মায়া দু'বাটি দুধও দু'জনের থালার সামনে আগাইয়া দিল।

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'দুধ কেন?'

নরেন বলিল, 'দাদার দুধ আছে তো?'

মায়া বলিল, 'ওঁর দুধ লাগবে না।'

খাইয়া উঠিয়া নরেন ঘরে গেল, অপিসে একজন একপয়সা দামের একটি চুরুট উপহার দিয়াছিল, বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া সবে চুরুটটি ধরাইয়াছে, হরেনের ছোট মেয়ে অমলা আসিয়া খবর দিল, 'বাবা তোমায় ডাকছে কাকু।'

নরেন অন্য কথা ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে দাদা কখন বাড়ী ফিরিয়াছে টেরও পায় নাই। জানালার সিমেণ্টের উপর চুরুটটি নামাইয়া রাখিয়া একটু অস্বস্তির সঙ্গেই সে হরেনের কথা শুনিতে গেল। এমন সময় বাড়ী ফিরিয়া তাকে ডাকিয়া হরেনের কি বলিবার থাকিতে পারে?

হরেন তাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, 'একেবারে টাকা নেই বলেছিলে, এই টাকা কটা রাখো। আর শোনো, বসাকদের কোম্পানীতে একটা কাজ ঠিক করে এলাম। বুড়ো কদিন থেকে আমায় বলছিল— তুমি তো চেনো বুড়োকে, চেনো না? শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু

কি আর করা যায়, সংসার তো চালানো চাই। মেয়েটারও বিয়ে দিতে হবে দু'দিন পরে। এই সব ভেবে—'

হরেনের ভাব দেখিয়া মনে হয়, একটা চাকরী ঠিক করিয়া আসিয়া সে যেন অপরাধ করিয়াছে এবং নিজেকে সমর্থন করার জন্য নরেনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতেছে। হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে ডাকিল, 'অমলি!'

অমলা আসিলে বলিল, 'তোর কাকীমাকে বলতো গিয়ে, আমি ভাত খাব না শুধু দুধ খাব।'

নরেন নিজেই মায়াকে খবরটা জানাইয়া আসিল। হরেনের চাকরীর খবরের চেয়ে সে শুধু দুধ খাইবে এই খবরটাই যেন মায়াকে বিচলিত করিয়া দিল বেশী। গৃহিণীর কর্তব্য পালনের জন্যই সে যে আজ একফোঁটা দুধও রাখে নাই, দুধের কড়াইটা পর্য্যন্ত মাজিবার জন্য কলতলায় বাহির করিয়া দিয়াছে! কি হইবে এখন?

'বিমলকে ডাকো শীগ্‌গির—আর, ক'আনা পয়সা দাও।'

বিমল মোড়ের ময়রার দোকান হইতে দুধ আনিতে গেল, নরেন ঘরে গিয়া আবার বিছানায় আরাম করিয়া বসিল। চুরুটটা নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রে সহজে ঘুম না আসিলে দরকার হইতে পারে ভাবিয়া দু'টি সিগারেট নরেন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম না আসিলে গভীর রাত্রে ক্রমাগত সিগারেট টানিবার ইচ্ছাটা কেন যে প্রচণ্ড হইয়া উঠে কে জানে! বিমলকে পাঁচটা সিগারেটও আনিতে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই সঞ্চিত সিগারেটের একটি ধরাইয়া সে টানিতে লাগিল। যার যা টানা অভ্যাস সেটা না হইলে কি তার আরাম হয়!

হরেন আবার চাকরী করিবে, সংসারের অভাব অনটন দূর হইবে, এ চিন্তার চেয়ে অন্য একটা অতি তুচ্ছ কথা নরেনের বেশী মনে হইতে থাকে। কাল বাজার করার পয়সা কোথায় পাইবে সে ভাবিয়া

পাইতেছিল না, হরেন পাঁচটা টাকা দেওয়ায় এই দুশ্চিন্তার হাত হইতে সে রেহাই পাইয়াছে। বাজারের পয়সা পর্যন্ত না রাখিয়া দু'টাকা দিয়া লটারীর টিকিট কিনিয়াছে, এই চিন্তাটাও মনের মধ্যে বড় বেশী বিঁধিতেছিল। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাইয়া গেলে যে কি মজাটাই হইবে, এ কল্পনায় যেন তেমন সুখ হইতেছিল না। এবার চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত মনে কল্পনাকে আমল দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

পড়ার টেবিলের সামনে বসিয়া বিমল ভাবিতে থাকে, এতরাত্রে সে যে কষ্ট করিয়া তার খাওয়ার জন্য দুধ কিনিয়া আনিয়াছে, পাকে প্রকারে জ্যেঠা মহাশয়কে এখবরটা জানাইয়া দিতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত। সকালের ব্যাপারে জ্যেঠামশায় যদি চটিয়া থাকে, কথাটা শুনিয়া খুসী হইতে পারে। খুসী হইলে হয়তো—

রাত্রির মত মায়ার সংসারের হাঙ্গামা চুকিতে এগারটা বাজিয়া গেল। হরেন তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিন সন্ধ্যার পরেই নেশা জমিয়া আসে, এগারটা বারটা পর্য্যন্ত ঝিমানোর আরাম ভোগ করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ সে সুখটা ফস্কাইয়া গিয়াছে। রাত ন'টা পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া এমন শ্রান্তই সে হইয়া পড়িয়াছিল যে ভাল করিয়া নেশা জমিবার আগেই ঘুম আসিয়া গিয়াছে। নরেন চিৎ হইয়া শুইয়া তৃতীয়বার লটারীর টিকিটের লেখাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়িতেছে। বিমলও পড়ার টেবিল ছাড়িয়া কয়েকখানা বই আর খাতা-পেন্সিল লইয়া বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মুখে তার গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ হইতে সে মনে মনে একটা গল্প গড়িয়া তুলিতেছিল। 'কলেজ হইতে সবিতার গাড়ীতে মোড় পর্য্যন্ত আসিবার সময় একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়া গিয়াছে, হাসপাতালে সে আর সবিতা একটা ঘরে পাশাপাশি দু'টি বেডে পড়িয়া আছে।

সবিতার বিশেষ কিছু হয় নাই, সবিতাকে বাঁচাইতে গিয়া তার আঘাত লাগিয়াছে গুরুতর। ডাক্তারের বারণ না মানিয়া সবিতা বেড ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া তার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে।' গল্পটি যখন জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তখন বিমলের মনে পড়িয়া গিয়াছে, আহত হইয়া এক হাসপাতালে গেলেও তাদের তো এক ওয়ার্ডে রাখিবে না!

টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়া রাখিয়া মায়া খানিকক্ষণ ছেলের দিকে চাহিয়া রহিল। একবার ভাবিল, আর বেশী রাত জাগিতে ছেলেকে বারণ করে। তারপর ভাবিল, বড় হইতে হইলে রাত জাগিয়া না পড়িলে চলিবে কেন! এ পর্য্যন্ত ছেলের পরীক্ষাগুলি ভাল হয় নাই, এবার একটু রাত জাগিয়া যদি মেডেল পায়, বৃত্তি পায়—

শরীরে শ্রান্তি আসিয়াছে কিন্তু চোখে ঘুম আসে নাই। একটি পান মুখে দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া মায়া দ্রুতবেগে ছেলের মেডেল আর বৃত্তি পাওয়ার দিনগুলি অতিক্রম করিয়া যায়। গিয়া পৌঁছায় সেই সব দিনে, বিমল যখন মস্ত চাকরী করিতেছে, ঘরে একটি টুকটুকে বৌ আসিয়াছে—।

বাড়ীতে আপিম খায় একজন কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখে সকলেই। হরেনের পনের বছরের মেয়ে অমলা পর্য্যন্ত কাকীমার চোখ এড়াইয়া এতরাত্রে খোলা ছাতে একটু বেড়াইতে যায়—ছাতে গিয়া নানা কথা ভাবিতে তার বড় ভাল লাগে।

গুণ্ডা

হাকিম হুকুম দিলেন একদফায় সাত বছর এবং আরেক দফায় তিন বছর ফেলনার জেলে বাস করা প্রয়োজন। তবে দু'দফার দণ্ডটা এক সঙ্গেই চলিবে। হুকুম শুনিয়া ফেলনার চোখে পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল। এজলাসের আর সকলকে উপেক্ষা করিয়া সে চাহিল শ্যামলালের দিকে। শ্যামলাল তার উকিল। দাও দাও করিয়া ফেলনাকে প্রায় ফতুর করিয়া ফেলিয়াছে। ফেলনার দৃষ্টির মানে খুব স্পষ্ট ঃ দাঁড়াও শালা, তোমায় দেখে নেব।

উকিলরা চিরকাল মক্কেলকে ভরসা দিয়া থাকে, দেওয়াই নিয়ম। শ্যামলালের সঙ্গে ফেলনার ঠিক উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক নয়। শ্যামলালের ভরসা দেওয়াটাও প্রথার পর্যায়ে পড়ে না। এইজন্য ফেলনার রাগ হইয়াছে। শ্যামলাল দুঃখিত হইয়া ভাবিল, এসব লোক নিরেট মুর্খ, গুণ্ডা কি না!

'ভয় নাই। আপীল ঠুকে দিচ্ছি।'

'আরও মারবার মতলব আছে নাকি?'

শ্যামলাল নির্বিকারভাবে বলিল, 'তা আছে। তবে খালাস পাবি। নইলে ব্যবসা ছেড়ে দেশে গিয়ে পাট বুনব। মা কালীর নামে দিব্যি করলাম।'

নূতন যুক্তি আর প্রমাণে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় ফেলনা খালাস পাইল। আইন সত্যই উদার ও নিরপেক্ষ। সাধারণ আইন এমন নিরপেক্ষ বলিয়াই তো বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য বিশেষ আইন দরকার হয়।

শ্যামলাল বলিল, 'দেখলি ?'

ফেলনা তার পায়ের ধুলা নিয়া বলিল, 'আজ্ঞে দেখলাম বৈকি। আপনি সব পারেন। তা আপীল করিয়ে যা পেলেন, আগে বললে নয় এমনিই দিয়ে দিতাম ? মিছে ভোগালেন কেন ?'

শ্যামলাল মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিল, 'তা কি আর তুই দিতি রে হনুমান, তখন বলতি কে কার কড়ি ধারে। আমিই বা চাইতাম কোন মুখে ? ভিখ্ মাগা তো পেশা নয়।'

শ্যামলালের শরীরের হাড়ের ফ্রেমটা লম্বা চওড়া, গায়ে মাংস নাই, শুকনো কটা মুখে কামান চোয়াল উদ্ধত প্রতিবাদের মত স্পষ্ট, আর স্পষ্ট নিবিড় কালো মোটা ভুরু। রগের চুলে পাক ধরিয়াছে। কাণে একরাশি চুল। মুখের দিকে চাহিতে হইলে বেঁটে ফেলনাকে মুখ তুলিতে হয়।

ফেলনার হাতে একটি পয়সা নাই, শ্যামলাল তাকে তিনটি টাকা দিল। উপদেশ দিল এই বলিয়া ঃ সাবধানে থাকবি কিছু দিন, কিছু জমাবি। ধরা ফের পড়বি দুচার-ছ'মাসের মধ্যে, পয়সা না দিলে কিন্তু কেস ছোঁব না, বলে রাখছি আগে থেকে।'

মুখের ভারি মোটা চামড়া কুঁচকাইয়া সাদা ধবধবে দাঁত বাহির করিয়া ফেলনা হাসে। জেল হইলে ফেলনার রাগ হইত, দিন মাস বছর ধরিয়া রাগটা বাড়িত এবং জেলের বাহিরে আসিয়া সকলের আগে বুঝাপড়া করিত শ্যামলালের সঙ্গে। খালি গায়ে শ্যামলালের পাঁজরের নীচে যে হৃদপিণ্ডটা ধুক ধুক করিতেছে দেখা যায়, খুব সম্ভব সেটাই একদিন সুযোগ মত ফুটা করিয়া দিত। এখন আর রাগের কোন কারণ নাই। বিপজ্জনক প্যাঁচ করিয়া বেশী টাকা সে যে আদায় করিয়াছে সেটা শ্যামলালের বাহাদুরীর পরিচয়। ফেলনার শ্রদ্ধা ও

বিশ্বাস তাতে বাড়িয়াই গিয়াছে। সে শুধু বুঝিতে পারে না, বিলকুল জমা করার জন্য লোকটার এত টাকার খাঁকতি কেন।

আগে খুব কষ্ট পাইয়াছে—বৌ-এর মাথা একটু খারাপ হইয়া যাওয়ার মত কষ্ট, বিনা চিকিৎসায় ছেলে মরিয়া যাওয়ার মত কষ্ট। চিরদিনের মত তার দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পালোয়ানের খোরাক দরকার ছিল, অজীর্ণ রুগীর পথ্য জুটিত না। শুধু জল খাইয়া দিনের পর দিন তার জলখাবারের প্রয়োজন মিটিত। বলিতে বলিতে শ্যামলাল দাঁতে দাঁতে ঘষিতে থাকে। হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বলে, 'আয় পাঞ্জা।' ফেলনার লোহার মত আঙ্গুলগুলি সরু সরু আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'গায়ের জোরের বড়াই করিস, ডাম্বেল মুগুর ভেঁজে শরীরটা যা করেছিলাম দেখিস নি তো। তোকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতাম তখন।'

এসব ফেলনা বুঝিতে পারে না। অতীতের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য এখন ফোঁস ফোঁস করা কেন? ফুটপাতে ফেলনার কত রাত কাটিয়াছে, ছোঁ মারিয়া খাবারের দোকান হইতে খাবার তুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পেট ভরার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, সে তো এসব কথা ভাবিয়া কখনো মাথা গরম করে না।

শ্যামলাল বলিল, 'রাসিকে বলিস গিয়ে, বালাটা শুধু বাঁধা রেখেছি, আংটিটা আছে। কাল পরশু পাঠিয়ে দেব।'

'আমায় দ্যান না?'

'তোকে দেবার জন্য আংটি পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি না?'

ফেলনা সকৌতুকে হাসিল। শ্যামলালের পকেটেই হয়তো আংটি আছে, তাকে বিশ্বাস করিয়া দিবে না। এ অবিশ্বাস অন্যায় নয়। আংটি হাতে পাইলে ঘরে গিয়া পৌঁছানোর আগেই সে বেচিয়া দিত।

তার মনের কথা এমনভাবে টের পাইয়া যায় বলিয়াই তো মানুষটাকে সে এত পছন্দ করে।

আজ নিজেকে ফেলনার শ্রান্ত মনে হয়। মুক্তিলাভের আনন্দ ও উত্তেজনা কড়া-পড়া মনে কখন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সাত বছরের জন্য জেলে গেলেও যেন তেমন কিছু আসিয়া যাইত না। বাধা ঠেলিয়া ঠেলিয়া গায়ের জোরে তার স্বাধীনভাবে বিচরণ, স্বাদগন্ধ বৈচিত্র্যহীন তার জীবন। জেলে গেলে যা কিছুর অভাব হয়, সে সমস্তের দাম বড় কম তার কাছে। সন্ন্যাসী শান্তি দিয়া মায়া কাটায়, ফেলনা মায়া কাটাইয়াছে উত্তেজনায়। মমতা অনুভব করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে, হিংসাও তার নাই। মানুষ তাকে পশুর মত নির্মম ও হিংস্র মনে করে। পশুর মতই নিষ্ঠুরভাবে সে হিংসাত্মক কাজ করে, নির্মমতার উল্লাস আর হিংসার জ্বালা এতটুকুও অনুভব করে না। ছোরা দেখাইয়া পকেট খালি করা নিছক তার পেশা, ক্ষুধা মিটানো আর হৈ চৈ করা তার শুধু বাঁচিয়া থাকা! ফুটপাতে দলে দলে যারা ফেলনার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, তার জীবনের একটি দিনের দুরন্ত উপভোগ তাদের হয়তো সাতদিন শয্যাশায়ী করিয়া রাখিবে। কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে একঘেয়ে জীবন যার, ফেলনার কাছে এ-ফেলনার জীবনের চেয়ে তার কাছে তার জীবন অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। ফেলনা কখনো রোমাঞ্চ অনুভব করে না। জীবন তাকে এলানো চুলের মৃদু স্পর্শ দেয় না, নয় দিয়া আঁচড় কাটে।

বড় রাস্তায় জল দেওয়ার সময় গলির মুখের কাছে খানিকটা ভিজাইয়া দিয়াছিল। রোদ আর বাতাসে বড় রাস্তার জল শুকাইয়া গিয়াছে, গলির ভিতরের অংশটুকু এখনো ভিজা। চেনা মানুষের কাছ হইতে ফেলনা প্রথম অভিনন্দন পাইল সেইখানে। কাদেরের

পানবিড়ির দোকানের পাশে রোয়াকে বসিয়া সাত-আট জন বিড়ি বানাইতেছিল, ফেলনাকে দেখিয়াই তারা একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল। ধারের জন্য কাদেরের সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছিল, দু'পয়সা প্যাকেটের একটি সিগারেট দিয়া কাদের তাকে খাতির করিল। নাসিম সাগ্রহে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কদিন আগে ফেলনা যে তার নাকটা থেঁৎলাইয়া দিয়াছিল, সে যেন তা ভুলিয়াই গিয়াছে।

অপরাহ্ণেই গলির মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে মনে হয়। কোন কোন বাড়ীর ভিতরে কলতলায় স্ত্রীলোকদের সোরগোল কাণে আসে, তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া প্রসাধন সারিয়া সহরের হাটের জীবন্ত পণ্যগুলি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবে। নিধু মালী মালাই বরফের হাঁড়ি মাথায় পথে বাহির হইল। কিষণলাল তার পানের দোকানের একপাশে বিক্রীর জন্য টাটকা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে। পাশে দেশী মদের দোকানে একে দুয়ে মানুষ ঢুকিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। রাত্রে এ গলি জীবন পায়, এখন হইতেই চারিদিকে তার সূচনা। প্রতি পদক্ষেপে ফেলনার বিচিত্র অভিনন্দন জুটিতে থাকে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কেউ উৎকট তামাসার মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করে, ছবির ফ্রেম বাঁধিতে বাঁধিতে কেউ মুখ তুলিয়া দাবী জানায়, সম্মুখ হইতে আসিয়া কেউ গাঁজার ছাপ মারা হাতে নীরবে তার হাত চাপিয়া ধরে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানে তার মুখ ফিরাইয়া কেউ জানালার ফাঁকে হাসি-ভরা মুখখানি সামনে মেলিয়া ধরে। দিগ্‌বিজয়ী বীর যেন জয়গৌরবে মণ্ডিত হইয়া তার রাজধানীতে ফিরিয়াছে।

রাসির কাছে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনাই পাওয়া গেল।

'এক মাসের মধ্যে আমার বালা এনে দেবে, বলে রাখলাম।'

'বালা নাকি দিতে চাস নি শুনলাম ?'

'চাই নি তো। কেন দেব ? সাত বছর শ্বশুর ঘর গেলে কে আমায় পুষত শুনি ? আমি বলে তবু দিইছি।'

ফেলনাও তাই ভাবিতেছিল। তার জগতে এ একটা অতি খাপছাড়া অনিয়ম। রাসির এ কাজের কোন মানে হয় না। প্রথমে সে বালা দিতে চায় নাই, তাই ছিল স্বাভাবিক। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে যার মৃত্যুর চেয়ে বেশী ভয় করিতে হয়, নিজের যতটুকু আছে তাকে তাই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, স্বার্থত্যাগের বিলাসিতা তার জন্য নয়। একটি কাঁসার বাসনের জন্য তার কত মমতা, এক জোড়া বালা আর আংটি সে ফেলনার জন্য কি করিয়া দিল ?

মোটা কাঁচের গ্লাসে রাসি চা আনিয়া দেয়, এনামেল-চটা লোহার বাটিতে দেয় মুখরোচক পেঁয়াজবড়া। কথা সে বেশী বলে না, টুকিটাকি কাজ করিয়া বেড়ায়। কার সাধ্য অনুমান করিবে সে খুসী হইয়াছে। শ্যামলাল ভরসা দিয়াছিল, তবু কি ভয়ে ভয়ে যে তার কটা দিন কাটিয়াছে! ফেলনা তো গিয়াছে, বালা আর আংটিও বুঝি তার গেল। এখন ফেলনা ফিরিয়া আসিয়াছে, গয়না বাঁধা রাখিয়া তাকে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছে' এবার তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে। বালা আর আংটি তো অল্পদিনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবেই, আর কিছু কি দিবেনা সে তাকে ? তার এতবড় স্বার্থ ত্যাগের কোন পুরস্কার ?

পিঁড়িটা রাসি মাটির দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখে, ছেঁড়া কাপড়খানা কুঁচকাইয়া ফেলে, গামছাটি মেলিয়া দেয়, বাতি সাফ করিতে বসিয়া বলে, 'কেরাসিন আনতে হবে দু'পয়সার।'

গলির ওপারে তারাপদর কারখানায় জোরালো বৈদ্যুতিক বাতি

জ্বালিয়া কাঠের মিস্ত্রিরা কাজ করে, দুটি জানালা দিয়া রাসির ঘরে আলো আসিয়া প'ড়ে। বাতি না জ্বালিয়া সেই আলোতেই ক'দিন রাসির চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা একে একে ফেলনার খবর নিয়া যায়। সকলেই তাকে ভয় করে, পুলিশকে হার মানাইয়া জেলের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসায় ভয়টা সকলের বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীওলা ভূষণ ধনুকের মত বাঁকা পিঠের ডগায় বসানো নড়বড়ে মাথাটি নিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া যায়, ফোকলা মুখের অজস্র অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে অতীত অভিজ্ঞতার গল্প বলে। জীবনে সবশুদ্ধ সতর বছর সে জেলে কাটাইয়াছে। অভিজ্ঞতার পুঁজি তার কম নয়।

কিন্তু ফেলনার শুনিতে ভাল লাগে না। বড় একঘেয়ে মনে হয়। তার জীবনে যেমন একই ঘটনা বার বার ঘটিয়া আসিতেছে, ভূষণও যেন তেমনি বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছে একই গল্প। অন্ধকার, চকচকে ছোরা, মদ, মেয়েমানুষ, পুলিশ আর জেল। এই শুধু ভূষণের কাহিনীর উপকরণ।

শ্রান্তি যেন বাড়িয়া চলিতেছে ফেলনার। কেমন একটা অস্বস্তিকর অবসন্নতায় গভীর আলস্য জাগিতেছে। ভূষণ চলিয়া গেলে সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। মস্ত হাই তুলিয়া বলিল, 'আরেকটু চা বানা দিকি রাসি।'

রাসি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 'চা? এখন চা খাবে?'

'তাই দে। কেমন ধারা লাগছে যেন, মাল রুচবে না।'

লণ্ঠনের লালচে আলোয় জানালা দিয়া সাদা আলো আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটা যেন একটু জ্বালা করিতেছে মনে হয়, মুখের বিস্বাদ ভাবটাও স্থায়ী হইয়া আছে। রাতভোর হৈ চৈ করিয়া

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিবার পর এ রকম লাগে, আজ সন্ধ্যারাত্রেই অকারণে সেইরকম লাগিতেছে। শুধু তীব্র ঝাঁঝালো বিরক্তির বদলে এখন কেমন একটা ঘুমধরা আবেশ আসিয়াছে, চুপচাপ শুইয়া নানা কথা ভাবিতে ভাল লাগিতেছে। রক্তশোষা লোভের সঙ্গে শ্যামলালের দরদের কথা, হৃদয়হীন স্বার্থপরতার সঙ্গে রাসির উদারতার কথা, আর তার মুক্তিতে সকলের খুসী হওয়ার কথা। চা আনিয়া দিয়া রাসি বলিল, 'দুধ একটুকুন কম হল। এক পয়সার দুধ দিইছে এ্যাত্তোটুকুন, সেবারে চা বানাতেই প্রায় শেষ।'

রাসি একটু বসে। ফেলনা যেন কেমন ভাবে তাকে দেখিতেছে। সাদা চোখে এমনভাবে তাকায় কেন? চোখ কিন্তু ফেলনার একটু লাল মনে হইতেছে।

ব্যাপারটা রাসি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনেকদিন আগে সাদা চোখেই যখন তখন ফেলনা এমনিভাবে তার দিকে তাকাইয়া থাকিত, শরীরে কেমন একটা শিহরণ বহিয়া গিয়া আপন হইতে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। আজ হাসিটা দেখা দিতেছিল, পরবর্ত্তী অভ্যাসে সেটা রাসি চাপিয়া গেল।

রাসির কপালে একটা কাটা দাগ আছে! একদিন ফেলনা তাকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, কপালটা ঠুকিয়া গিয়াছিল জানালার পাটে। রাসি তার চেয়েও বেঁটে, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া তবে জানালা দিয়া রাস্তা দেখিতে পায়। খুব নামাইয়া পাতা কাটিলেও রাসির কপালের দাগটা ঢাকা পড়ে না, তবু এতকাল একবারও দাগটা ফেলনার চোখে পড়ে নাই। রাসির ফ্যাকাসে মুখে দাগটা ফেলনার চোখে বড়ই বেমানান ঠেকিতেছিল। বালার অভাবে রাসির হাত দুটিও ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছে।

ফেলনার একটু দায়িত্ব বোধের অনুভূতি জাগে। মনে হয়, কি একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে সে যেন আটকা পড়িয়া গিয়াছে। রাসির আংটি শ্যামলাল তার হাতে দিলে আসিবার পথে নয়ান স্যাঁকরার দোকানে সেটা সে বিক্রী করিয়া দিত, কিন্তু এখন যেন আর ওসব চলিবে না। শুধু আংটি নয়, রাসির বালাটিও যেন যত শীগ্গির পারে আনিয়া দিতে হইবে রাসিকে।

রাসি সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ব্যাপার কি বল দিকিন তোমার? আসবার সময় সেটা চালিয়ে এসো নি তো, সেই সাদাগুঁড়ো?'

'দুৎ। আমার ওসব নেই।'

'ওদিকে ঘেঁষোনি, সাবধান। দুদিনে কাবু করে ফেলবে, মানুষটি থাকবে না আর। নিজের ছায়া দেখে ভয় লাগবে। কি ছিল পরশা কি হয়েছে দেখছো তো নিজে?'

ফেলনা তার মোতির মত সুন্দর দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—'একটা কিছু দে দিকি রাসি, গায়ে জড়াই। শীত শীত লাগছে।'

রাত প্রায় ন'টার সময় রাসির ঘরে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিল। তার নাম ম'বুব। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা। পাতলা ফুলকাটা পাঞ্জাবীর নীচে গোলাপী গেঞ্জী দেখা যায়। মোটা কব্জির কাছে পাঞ্জাবীর হাতা টাইট করিয়া বোতাম লাগানো। মুখখানা গোল, ভাঁজ পড়ার উপক্রম করার মত দুটি গালের গড়নের জন্য মুখ দেখিলে ভয় করে।

'কাদের খবর দিলে। চটপট আগে খবর না দিয়ে ব্যাটা খচ্চর আছে কিনা, এত্না দেরীতে গিয়ে খবর জানালে। জানতে পেরে ছুটে এলাম।'

ফেলনার উঠিয়া বসিতে কষ্ট হইতেছিল। চোখ দু'টা আরও বেশী

জ্বালা করিতেছে। ম'বুবকে চৌকীর একপাশে বসিতে দিয়া জোরে একবার সে মাথাটা ঝাকি দিয়া নিল। রাসি নীরবে ঘরের দরজায় চৌকাট ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। হঠাৎ কেউ আসিয়া পড়িয়া কিছু শুনিতে না পায়। ম'বুব বলিল, 'একটা দাঁও আছে, মস্ত দাঁও। ঝুঁকি একদম কিছু নেই। আমি, ওসমান আর শিউ শিং সলা করছিলাম।'

শুনিতে শুনিতে ফেলনার চোখ জ্বল জ্বল করিতে থাকে। শীত করিয়া তার যে জ্বর আসিয়াছে, জিভ্ বিস্বাদ লাগিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতেছে, সব যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সে কিন্তু ঝিমাইয়া গেল। আজ রাত্রেই যদি কাজটা শেষ করিতে হয়, তার পক্ষে যোগ দেওয়া কি সম্ভব? কেবল শরীর খারাপ বলিয়া নয়, এসব বড় কাজে ঝুঁকি বেশী, নিজে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা না করিয়া এসব ব্যাপারে সে হাত দেয় না। তা'ছাড়া, তার আস্তানার বড় কাছাকাছি হইয়া যাইতেছে। সে একটা মস্ত বিপদ। পুলিশ প্রথমেই তাকে সন্দেহ করিবে।

ফেলনা রাসির দিকে তাকায়। রাসি মাথা নাড়ে।

ম'বুব অনেক তোষামোদ করিল, অনেক লোভ দেখাইল। তারপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া রাসির দিকে চাহিয়া ফেলনা বলিল, 'বড় দাঁও ছিল রাসি। তোর বালাটা আনা যেত।'

'বালা পরে আনা যাবে।'

কাছে আসিয়া ফেলনার কপালে হাত দিয়া রাসি চমকাইয়া গেল। 'এই জ্বর নিয়ে দাঁও মারতে যাবে! মাথা ঘুরে পড়ে যাবে না রাস্তায়?'

রাত প্রায় এগারটায় ম'বুব, ওসমান আর শিউ শিং তিনজনেই আরেকবার ফেলনাকে বুঝাইয়া রাজী করিতে আসিল। কিন্তু ফেলনার জ্বর তখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাকে রাজী করানোর প্রশ্নই ওঠে না। অপ্রস্তুত হইয়া তিনজনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আপ্‌শোষ জানাইয়া চলিয়া গেল।

ফেলনা বিড় বিড় করিয়া বলিল, 'গেলে হত রাসি। মস্ত দাঁও ছিল। বালাটা আনা যেত।'

কপালে জলপটি দিয়া বাতাস করিতে করিতে রাসি বলিল 'চুপটি করে ঘুমাও বলছি, হাঁ। মরতে বসেছে, দাঁও মারবার সখ।'

শেষ রাত্রে, প্রায় তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে, পুলিশ আসিয়া ফেলনাকে টানিয়া তুলিল। জ্বর একটু কমায় সারারাত ছটফট করিয়া সে তখন শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিল।

রাসি কাতরভাবে বলিতে লাগিল, 'দেখছো না জ্বর? ঘর ছেড়ে রাতে একবারটি বাইরে যায় নি। শুধাও বাড়ীর পাঁচটা লোককে সত্যি কি মিথ্যে?'

কাছাকাছি একটা খুন জখমের ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। যারা ধরা পড়িয়াছে, তাদের অনেকবার ফেলনার কাছে যাতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে। ফেলনা নামজাদা গুণ্ডা। তাকে কি এত সহজে রেহাই দেওয়া যায়!

যাওয়ার সময় ফেলনা বলিয়া গেল, 'শ্যামলালবাবুকে একটা খবর দে রাসি।'

কাজল

বেশী মানসিক উত্তেজনার সময় সবচেয়ে দরকারী কথাটাই মানুষ ভুলিয়া যায়।

রাণী জানিত সন্ধ্যার একটু পরেই বিকাশ আসিবে। একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, বিকাশ অনেক করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে, তার সঙ্গে রাণীর সেখানে যাওয়া চাই। কথায় কিছু প্রকাশ না পাক, বলার ভঙ্গির মধ্যে কি যেন ছিল বিকাশের, আজ সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া রাণীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার আগেই চুল বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া এবং আর সব সাধারণ প্রসাধন শেষ করিয়া সে ভাবিয়াছিল, বিকাশ আসিয়াছে খবর পাইলে চোখে কাজল দিয়া নীচে যাইবে। মিনিট দশেক মানুষটাকে একা বসাইয়া রাখাও হইবে, সত্ত সত্ত কাজল দেওয়ায় চোখ দুটিও তার জল্ জল্ করিবে অন্য দিনের চেয়ে বেশী।

মুগ্ধ বিকাশ আরও বেশী মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

কে জানে মানুষের পছন্দের রীতিনীতি কি অদ্ভুত! রাণীর মধ্যে ভাল লাগিবার এত কিছু থাকিতে বিকাশ পছন্দ করিয়াছে তার চোখ দুটাকে! যেমন তেমন পছন্দ করা নয়, এরকম চোখ নাকি সে আজ পর্য্যন্ত আর কোন মানুষের ছাখে নাই, মানুষের যে এমন অপরূপ চোখ থাকিতে পারে, সে নাকি তা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

'এমন যার চোখ, তার মন কি বিচিত্র হবে আমি তাই ভাবি।'

বিকাশ একদিন এই কথা বলিয়াছিল।

অথচ কাজলের ছোঁয়াচ না পাইলে কেমন যেন ছোট আর গোল আর ফ্যাকাসে দেখায় রাণীর চোখ। অনেকদিনের চেষ্টায় রাণী চোখের প্রসাধনের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। অনেক যত্নে সে কাজল তৈরী করে। অতি সাবধানে সে চোখের পাতায়, চোখের কোণে আর ভুরুতে কাজলের ছোঁয়াচ দেয়—একটু হাত কাঁপিয়া গেলে ভাল করিয়া সব ধুইয়া মুছিয়া নূতন করিয়া দিতে হয়। কাজল দেওয়ার পর চোখ দুটিকে তার একটু বড়, একটু টানা, একটু বেশী কালো আর ভাসাভাসা মনে হয়। এ যে তার চোখের স্বাভাবিক রূপ নয়, সহজে তা ধরা যায় না। দৃষ্টি যার একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ তার পক্ষেও বুঝা কঠিন, চোখে রাণী কাজল দিয়াছে। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যার অভিজ্ঞতা থাকে প্রচুর, তার পক্ষেই কেবল মাঝে মাঝে টের পাইয়া গিয়া মনে মনে একটু হাসা সম্ভব।

মনে মনে হাসিবেই যে এমন কোন কথা নাই, রাণীর চোখের কাজল-বৈচিত্র আবিষ্কার করার মত চোখ যার আছে, হারানোর বদলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যার স্বভাব, হাসির বদলে তার মনে মায়া জাগাই স্বাভাবিক। কাজল দেওয়ার কায়দার মধ্যে রাণীর যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে, মনে মনে তার প্রশংসা করাও আশ্চর্য্য নয়। তবে রাণীর কথা আলাদা। চোখের কাজল মনে তার যে কালিমার ছোঁয়াচ দিযাছে, ফাঁকি ধরা পড়ার ভয়টাই তার সবচেয়ে জোরালো অভিব্যক্তি।

কত তুচ্ছ ব্যাপার চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দেওয়া রূপ বাড়ানোর নামে মেয়েদের কত হাস্যকর প্রসাধনের প্রক্রিয়া মানুষের চোখ-সহা হইয়া গিয়াছে; রূপের ফাঁকি আড়াল-করা কত প্রকাণ্ড ও স্থূল রঙের পর্দা মানুষ চাহিয়া দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, কৃত্রিম

রূপের মোহেই বেশী মুগ্ধ হইতে শিখিয়া রীতিমত দাবী করিতে শিখিয়াছে কৃত্রিম রূপ। কি আসিয়া যায় চোখে একটু কাজল দিলে? প্রথম প্রথম রাণীও তাই ভাবিত, এটা যে একটা খুব বড় অপরাধ এ ধারণা তার ছিল না। তারপর অল্পে অল্পে তার নিজের ফাঁক তার নিজের কাছেই বড় হইয়া উঠিয়াছে, নিজে নিজেই সে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে, চোখে কাজল দিয়া সর্বদা সে সকলকে ঠকায়। একবার যে টের পাইবে, সেই তাকে ছি ছি করিবে

এ ভয় চরমে উঠিয়াছে, কাজল দেওয়া চোখ দেখিয়া বিকাশের মুগ্ধ হওয়ার পর মাঝে মাঝে বিকাশ যেন সত্যই অবাক হইয়া তার চোখের দিকে চাহিয়া থাকে, কি যেন খুঁজিয়া পায় আর কি যেন খুঁজিয়া পাইতে চায়। রাণী হয়ত তখন কথা বলিতেছে, কি বলিতেছে ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় চোখ মুদিয়া ফেলিবার প্রায় অদম্য একটা প্রেরণা দমন করা।

বিকাশ কিন্তু হঠাৎ খুসী হইয়া ওঠে, যা খুঁজিতেছিল যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। বলে, 'সত্যি, মানুষ আর সব পারে, চোখের সঙ্গে মনের যোগটা কেবল ঘুচিয়ে দিতে পারে না।'

শুনিয়া পাংশু মুখে রাণী একটু হাসে। বিকাশ তার চোখের ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছে এই ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া যায় না, ভয় তার হয় ভবিষ্যতের। এখন আর বিকাশ কিছু টের পাইবে না, পাইলে অনেক আগেই পাইত, অনেকবার সে তার চোখ দুটিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় রাণী এটুকু জানিয়াছে, প্রথম দু' একবার তার চোখের দিকে চাহিয়া যদি বিকাশ না বুঝিতে পারে চোখে সে কাজল দিয়াছে, সেদিন আর তার ধরা পড়িবার ভয় নাই। ধরা সে পড়িবে সেইদিন, যেদিন ঠিকমত

কাজল দেওয়া হইবে না, চোখের দিকে চাহিয়াই বিকাশ বুঝিবে চোখের পরিচিত রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং আরও ভাল করিয়া টের পাইবে সেদিন, যেদিন তার কাজলহীন চোখ চোখে পড়িবে।

একবার যদি বিকাশ তার স্বাভাবিক চোখ দেখিতে পায়, গভীর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরিয়া যাইবে। আর সে তার ধারে কাছেও কোনদিন আসিবে না।

নিজের ঘরে বসিয়া এই কথাটাই রাণী আজ ভাবিতেছিল। অন্য দিনের চেয়ে ভাবনাটা আজ চিন্তারাজ্যের একটু উঁচু স্তরে চড়িয়া গিয়াছিল, যেখানে মানুষের বুদ্ধি জীবনের কতকগুলি দুর্বোধ্য রহস্যানুভূতির ব্যাখ্যা খুঁজিয়া মরে, জীবনের অনিয়মগুলির মধ্যে যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করে, আত্মচিন্তার প্রসঙ্গে সমালোচনা করে নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

এমন একটা অবস্থা বিকাশ কেন সৃষ্টি করিয়াছে, এই একটিমাত্র ছলনাকে যাতে প্রশ্রয় দিয়া চলা ছাড়া সে আর উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না? আর কোন বিষয়ে কোন কিছুই তো সে বিকাশের কাছে লুকাইবার চেষ্টা করে না। কি না জানে বিকাশ তার সম্বন্ধে? অ্যাশ-ট্রের বদলে ছাই ফেলার জন্য ভাঙ্গা কলাই করা বাটি বিকাশকে আগাইয়া দিতে রাণীর কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ হয় নাই। কাকার আশ্রয়ে দিনগুলি যে তার বিশেষ আরামে কাটিতেছে না, বিনয়বাবুর বাড়ীর কয়েকটি ছেলেমেয়েকে রোজ চারঘণ্টা পড়াইয়া সে যে অতি কষ্টে কলেজের খরচটা সংগ্রহ করে, সংসারের কাজকর্ম করিতে সে যে তেমন পটু নয়, সময়ও পায় না,—তাও বিকাশের অজানা নয়। কি সে বলিতে বাকী রাখিয়াছে বিকাশকে অথবা বিকাশ যাতে টের না

পায় সেজন্য চেষ্টা করিয়াছে? কেবল তার চোখ দুটিকে একটু কৃত্রিমতার আড়ালে রাখা ছাড়া?

তার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি বিকাশ হাসিমুখে মানিয়া নিয়াছে, তার গুণগুলিকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া রাখিয়াছে সহজ অবহেলায়। এমন সুন্দর দেহের গড়ন রাণীর, অনেক ভদ্রতা-অভ্যস্ত ভদ্রলোক পর্যন্ত চাহিয়া না থাকিয়া পারে না, কিন্তু আজ পর্যন্ত বিকাশের চোখে পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। চোখ নিয়া এত যদি বাড়াবাড়ি বিকাশ না করিত, কাজলহীন চোখ তাকে দেখাক-বা-না-দেখাক, চোখে যে সে একটু কাজল দেয়, এ কথাটা একদিন কি সাহস করিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিতে পারিত না বিকাশের কাছে।

এইসব ভাবিতেছে রাণী, এ বাড়ীর কর্তা তার কাকা মাধববাবুর সেজ মেয়ে নলিনী নীচে হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, 'ওগো মহারাণি! আপনার জন্যে এক ভদ্রলোক যে বাইরের ঘরে বসে আছেন একঘণ্টা।'

রাগে গা'টা যেন রাণীর জ্বলিয়া গেল। চোখে কাজল দেওয়ার উপর তাকে ভাল লাগা-না-লাগা নির্ভর করিবে কেন ভাবিয়া বিকাশের উপর মনের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হইতেছিল, নলিনীর অভদ্র হাঁক শুনিয়া সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল এ বাড়ীর হিংসুটে মানুষগুলির উপর। গট গট করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

চোখে আর কাজল দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। কে জানিত আত্মচিন্তার সময় এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়! বাহিরের ঘরটি অন্ধকার, জানালা দিয়া রাস্তার একটু আলো আসায় কেবল টের পাওয়া যায় একটি আবছা মূর্তি একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছে।

এতক্ষণে রাণীর মনে পড়িল, কাল রাত্রে এ ঘরের বাল্‌বটি ফিউজ হইয়া গিয়াছিল। আজ আপিস ফেরৎ মাধববাবু বাল্‌ব কিনিয়া আনিয়া লাগাইবেন।

‘অন্ধকারে বসে আছেন ?’

‘আলো না জ্বাললে কি করব বল ?’

আলো না জ্বালিবার কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া রাণী বলিল, ‘মোমবাতি আনিয়ে নেব একটা ?’

‘কি দরকার ? তার চেয়ে চল ঘুরে আসি।’

দুজনে বাহির হইয়া গেল। বিকাশের মোটরটি খুব বড় নয়, আনকোরা নতুনও নয়। দামী গাড়ী কিনিবার পয়সা বিকাশের আছে, কিন্তু ওভাবে পয়সা নষ্ট করিবার সখ তার নাই। মানুষটা সে একটু হিসাবী, গাড়ীর চাকচিক্যে মানুষের মনে ঈর্ষামেশানো সম্ভ্রম জাগাইয়া সুখী হওয়ার মত বোকামিকে সে প্রশ্রয় দেয় না। এইজন্য রাণী তাকে বড় ভয় করে। কোন্ তুচ্ছ খুঁতটি কত বড় হইয়া বিকাশের চোখে ঠেকিবে, কে তা জানে ? চল্লিশ বছর বয়সে মানুষ জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে কি চায় ? অহঙ্কার চায় না, ধৈর্যহীনতা চায় না, চাপল্য চায় না, সঙ্কীর্ণতা চায় না—এসব রাণী জানে। কিন্তু কি চায় ? ঝাঁঝহীন স্নিগ্ধ খানিকটা রূপযৌবন আর শান্ত-কোমল স্বভাব ? ভক্তি ? শ্রদ্ধা ?

যাই হোক, চোখ দুটি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু যে বিকাশের ভাল লাগিয়াছে আজ পর্যন্ত কথায় বা ইঙ্গিতে কোনদিন সে প্রকাশ করে নাই। ধরা যাক, তাকেই যদি বিকাশ জীবনসঙ্গিনী করে, তবে কি বলিতে হইবে চল্লিশ বছর বয়সে বিকাশের মত মানুষ জীবনসঙ্গিনীর মধ্যে মনের মত দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুই চায় না ?

এইবার হঠাৎ রাণীর মনে পড়িয়া গেল, চোখে আজ কাজলের ছোঁয়াচ দেওয়া হয় নাই। গাড়ী তখন বড় রাস্তার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ণ পথে খুব সাবধানে গাড়ী চালাইতে হইতেছে বলিয়া বিকাশ চুপ করিয়া আছে, বড় রাস্তায় পড়িলে কথা আরম্ভ করিবে। রাণীর সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসে, মাথাটা ঝিম ঝিম করিয়া ওঠে! আর কতক্ষণ? পনের মিনিট, কুড়ি মিনিট। তারপরেই নিমন্ত্রণ-বাড়ীর জোরালো আলোতে রাণীর এতদিনের সমস্ত আশার সমাধি। বিকাশ অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তার গোল, ফ্যাকাসে আর ছোট ছোট চোখ দুটির দিকে চাহিয়া থাকিবে। তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া চিরদিন যেভাবে কথা বলিয়াছে, যেরকম ব্যবহার করিয়াছে, তেমনিভাবে কথা বলিবে, সেইরকম ব্যবহার করিবে। যেন কিছুই ঘটে নাই। যথাসময়ে বাড়ীও পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে যাতায়াত কমিতে কমিতে তাদের বাড়ীতে বিকাশের পদার্পণ ঘটিবে কদাচিৎ—তাদের দুজনের মধ্যে বজায় থাকিবে সাধারণ একটা বন্ধুত্ব। হয়তো তাও থাকিবে না।

'কি ভাবছ?'

'কিছু না।'

রাণীর গলার আওয়াজ শুনিয়া বিকাশ চকিতে একবার তার মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলে না।

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা কি রাণী কখনো ভাবে নাই? সে ভাবনার সঙ্গে আজ সত্য সত্যই ব্যাপারটা ঘটিয়া যাওয়ার মধ্যে কত তফাৎ। নিজেই সে ছোট বিছানাটিতে শুইয়া কতদিন কল্পনা করিয়াছে, চোখে কাজল না দিয়াই বিকাশের সামনে একদিন বাহির হইবে, ডাকিয়া বলিবে, দ্যাখো তো কাজল না দিলে কেমন দেখায় আমার

চোখ? দেখিয়া বিকাশের যদি বিতৃষ্ণা জাগে, জাগিবে। চোখ দুটি একটু সুন্দর কম বলিয়াই যার ভালবাসা কর্পূরের মত উড়িয়া যায়, তাকে রাণী চায় না। কি দাম আছে ওরকম মানুষের? কাজলবিহীন বিশ্রী চোখ সমেত তাকে যে চাহিবে, না হোক সে বিকাশের মত বড়লোক, তার সঙ্গেই সে সুখী হইবে জীবনে। কিন্তু কল্পনার সেই উদ্ধত সাহসের চিহ্নটুকু আজ রাণী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। কথাটা মনে পড়িবামাত্র সেই যে বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর মনে হইয়াছিল একটা অদৃশ্য কি যেন তার বুকটা এত জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে যে নিশ্বাস টানিতেও তার কষ্ট হইতেছে, এখনও বুকের মধ্যে সেই চাপ একটুও কমে নাই। তাড়াতাড়ি ছোট ছোট নিশ্বাস নিতে হইতেছে রাণীকে, গাড়ী চলিতে না থাকিলে বিকাশ নিশ্চয় টের পাইয়া যাইত।

কিন্তু বিকাশ কিছু একটা নিশ্চয় টের পাইয়াছিল। অন্যদিন সে কত কথা বলে, আজ নীরবে গাড়ী চালাইয়া যাইতে লাগিল।

রাণীর তখন মনে পড়িতেছে নিজের বর্তমান জীবনের কথা: এ ভাবে তার কতদিন চলিবে। সমস্ত সকালটা বিনয়বাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াইতে কাটিয়া যায়, নিজের তাড়াতাড়ি ক্লাস থাকিলে বিকালে গিয়া পড়াইয়া চার ঘণ্টা পূর্ণ করিতে হয়। তাও আর বেশী দিন চলিবে না। বিনয়বাবু পুরুষ মাষ্টার রাখিবেন, পেটে যার বিদ্যা আছে। বাড়ীর কাজ করার সময় রাণী পায় না। মেয়েমানুষ খাওয়ার সময় পায় আর কাজ করার সময় পায় না, এত বড় অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা এ বাড়ীর কারো নাই। সকলে খোঁচায়, সময় সময় সে খোঁচা গালাগালির পর্যায়ে গিয়া পড়ে। রাণী মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যায়। সে জানে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই, প্রতিকার

করিতে গেলেও ঠকিবে সে নিজেই। সন্ধ্যার পর বাড়ীর কাজ সে হয়তো কিছু কিছু করিয়া দিবার সময় পায়, ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলে। কাজ করিলে রাত জাগিয়া পড়িতে হয়, রাত জাগিয়া পড়িলে চেহারা খারাপ হইয়া যায়। রাত্রে সাড়ে দশটা বাজিতে না-বাজিতে রাণী বিছানায় যায়, ঘুম না আসিলেও চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। মুখে ক্লিষ্টতার ছাপ পড়িবার ভয়ে দুশ্চিন্তার সঙ্গে প্রায়ই সে এমন লড়াই করে যে পরদিন আয়নায় মুখ দেখিয়া কান্না আসে।

বাড়ীর ভিতরটা বড় অপরিচ্ছন্ন। সেঁতসেঁতে ভিজা উঠানটার শ্যাওলা ঘষিয়াও তোলা যায় না। কমদামী পুরাণো আসবাব আর বাক্স-পেঁটরায় ঘরগুলি ভর্ত্তি, পা-পোষের কাজ চলে ছেঁড়া ভাঁজ করা বস্তায়, আলনার কাজ চলে দড়িতে, এখানে ছেঁড়া ময়লা কাপড় মেলা, ওখানে চট জড়ানো লেপের বস্তা ঝুলানো, সেখানে জমা করা ঘটি বাটি থালা। কয়েকটা নোংরা চীনামাটির কাপ-ডিসের কাছে চটা ওঠা কলাই করা বাটিগুলি দেখিলেই বুঝা যায় ওই বাটিতেই এ বাড়ীর অর্দ্ধেক লোক চা পান করে। তার উপর আছে বাড়ীর সকলের চালচলন আর কথাবার্ত্তা। যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকে রাণীর যেন দম আটকাইয়া আসে।

ওই বাড়ীতেই কি বাকী জীবনটা তার কাটাইতে হইবে? কলেজ বন্ধ হইলে বাহিরে বাহিরে দিনগুলি কাটাইয়া দিবার সুযোগটাও যে তার যাইবে নষ্ট হইয়া।

কাৎ হইতে হইতে রাণী প্রায় বিকাশের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। অল্প দূরেই একটা মোড় দেখা যাইতেছে, ওই মোড়টা ঘুরিলেই নিমন্ত্রণ বাড়ী। বাস্, তারপর সব শেষ। আজ সারাদিন সে অনেক কিছু কল্পনা করিয়াছিল

কিনা, আশা আজ চরমে উঠিয়াছিল কিনা, নিজের সামান্য একটু ভুলের জন্য আজই সব তার নষ্ট হইয়া গেল।

মোড়ে পৌঁছানোর আগেই বিকাশ গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। ইচ্ছা করিয়া কিনা কে জানে, এমন জায়গায় সে গাড়ী থামাইল, পথের ধারের বড় একটা দোকানের জোরালো আলো যেখানে ঠিক রাণীর একেবারে মুখে আসিয়া পড়ে। কিছু ভাবিয়া দেখিবার আগেই দু'হাতে রাণী মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

'আজ তোমার কি হয়েছে বল ত ?'

কথা বলিতে গিয়া রাণীর গলার স্বর ফোটে না। সহরের পথের গাড়ী ও মানুষের দৃষ্টি মিশ্রিত শব্দের বিরামহীন স্রোত তার দুই কাণে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে রাণীর। ডুমকায় সহরের বাহিরে মাঠের মধ্যে বিকাশের একখানা বাড়ীর কথা সে কেবল কাণে শুনিয়াছে, তবু মাঠের মধ্যে মস্ত একটা বাড়ীর বড় বড় থামওয়ালা চওড়া গাড়ী বারান্দায় ফ্রক্ পরা ছেলেমানুষ রাণী কেন মনের আনন্দে ডিগবাজী খায় এখন, চারিদিকে অবিশ্রাম বর্ষণের ঝম্ ঝম্ শব্দের মধ্যে ?

বিকাশ একটু ভাবিয়া বলে, 'তোমার শরীর ভাল নেই, আজ না হয় ওখানে না গেলে ? চলো ফিরে যাই। কেমন ?'

চোখের পলকে রাণী নিজের মুক্তির পথ দেখিতে পায়। এই সহজ উপায়টা তার এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ীর আলোর মধ্যে গিয়া না দাঁড়াইলেই তো তার চোখ দেখিবার সুযোগ বিকাশ পাইবে না। মুখ হইতে হাত সরাইয়া, খোঁপা ঠিক করিবার ছলে মুখে বাহুর ছায়া ফেলিয়া, রাণী বলে, 'তাই চলুন। সত্যি আজ শরীরটা ভাল নেই।'

দোকানের জোরালো আলোর সীমানা হইতে গাড়ী যতক্ষণ সরিয়া না যায়, রাণী খোঁপাই ঠিক করিতে থাকে। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়া সামলাইয়া নিয়া হাত নামাইয়া নেয়। মনটা হঠাৎ তার এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে বলিবার নয়। এমন একটা গভীর অবসাদ আসিয়াছে যে মস্তিষ্কের মধ্যে তার স্বাদের গুরুত্বটা যেন ভারি জিনিষ বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া পাহাড়ের নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার স্বপ্ন দেখার মত স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

'সোজা বাড়ী যাবে? গঙ্গার ধারে একটু ঘুরে গেলে বোধ হয় তোমার ভাল লাগত। যাবে?'

রাণী অস্ফুট স্বরে বলে, 'চলুন।'

হঠাৎ আবার ধাক্কা খাওয়ার মত চমক দেওয়া উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গার ধারে! বিকাশ তবে নিশ্চয় আজ কিছু তাকে বলিবে, একটা লেখাপড়া করিয়াও ফেলিবে তার সঙ্গে। কাজল না দেওয়া চোখ দেখার সুযোগ তো গঙ্গার ধারে নাই—এতদিন তার যে চোখ বিকাশ দেখিয়া আসিয়াছে সেই চোখের কথা কল্পনা করিয়াই বিকাশ আজ নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিবে। কত উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাই বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত রাণীর মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে। মাঠ ও গঙ্গার মধ্যে বিস্তীর্ণ রাস্তায় গাড়ীর গতি শিথিল করিয়া দেওয়া মাত্র তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে! কিন্তু বিকাশ যে কি ভাবিতে থাকে নিজের মনে সেই জানে, মুখে যেন আজ তার কথাই নাই। পাশে যে রাণী বসিয়া আছে, সব সময় যেন এটা তার খেয়ালও থাকিতেছে না।

রাণীর উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। গাড়ী দাঁড় করাইয়া

কিছুক্ষণ পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানোর পর বিকাশ হঠাৎ বলে, 'চল, এবার ফিরি।' ততক্ষণে রাণীর মন আবার বিষাদ ও বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। গাড়ী যখন বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল তার তখন মনে হইতেছে, সে বুঝি কয়েক রাত্রি ঘুমায় নাই। রোগশয্যাপার্শ্বে চার পাঁচ রাত্রি জাগিবার পর বাপের মৃত্যুর সময় নিজেকে তার এই রকম অবসন্ন, নিস্তেজ আর প্রাণহীন মনে হইতেছিল। সব চুকিয়া গিয়াছে। আজ যখন বিকাশ কিছু বলিল না, কোনদিন আর তার কাছে কিছু শুনিবার ভরসা রাণীর নাই।

রাস্তার আলোতে বিকাশ কি তার চোখ দেখিয়া আগেই কিছু টের পাইয়াছিল? তাই সে আজ এমন গম্ভীর, চিন্তামগ্ন? কি করিবে স্থির করিবার জন্য গঙ্গার ধারে আসিয়াছিল, এতক্ষণে মন ঠিক করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে?

বাড়ী পৌছিয়া রাণী ভদ্রতা করিয়া বলে 'বসবেন না?'

বিকাশ বলে 'বসব? না, আর বসব না।'

রাণী শ্রান্তকণ্ঠে বলে, 'আচ্ছা।'

বিকাশ কিন্তু যায় না, দাঁড়াইয়া থাকে। তার আপত্তি যেন শুধু বসিতে, দাঁড়াইয়া থাকিতে অনিচ্ছা নাই। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা, একটু বসি, জল খেয়ে যাই এক গ্লাস।'

রাণী তার মনের ভাব অনুমান করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া যায়। একটু মায়া হইতেছে বিকাশের। এতকাল যাকে জীবন-সঙ্গিনী করার কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া আসিয়াছে, আজ গোল গোল কুৎসিৎ চোখ দেখিয়া তাকে একেবারে ত্যাগ করিবার মতলব ঠিক করিয়া একটু খুঁত খুঁত করিতেছে মনটা, একটু অস্বস্তি বোধ হইতেছে। কিন্তু এরকম দয়া করা কেন? একটু বসিয়া এক

গ্লাস জল খাইয়া পরে কষ্ট দেওয়ার বদলে এখন চলিয়া গেলেই পারে বিকাশ !

মন্ত্রের মত রাণী আগাইয়া যায়। বাহিরের ঘর অন্ধকার, সেইরকম জানালা দিয়া মৃদু একটু আলো আসিতেছে। 'অন্ধকারে বসতে হবে কিন্তু'—বলিতে বলিতে চিরদিনের অভ্যাসের বশে হাত বাড়াইয়া রাণী দেয়ালের গায়ে সুইচটা টিপিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলো হইয়া যায়—ইতিমধ্যে নতুন বাল্‌ব লাগানো হইয়া গিয়াছে।

বিকাশের কাছে আর তার আশা করার কিছু নাই, তার কাজলহীন চোখ এখন আর বিকাশকে দেখাইতে ভয় পাওয়ারও তার কোন কারণ নাই, তবু রাণী চমকাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বিকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। যদি বা কোন আশা ছিল, রাণীর অজ্ঞাত কোন কারণে আজ কিছু না বলিয়া বিকাশ যদি পরে বলিবার কথা ভাবিয়া রাখিয়া থাকে, এতক্ষণে সব আশা চুকিয়া গেল। সত্যই সে বড় বোকা।

রাণীর মনে হয়, বিকাশের সামনেই সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে।

তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জল আনিবার জন্য সে ভিতরে যাইতেছে, বিকাশ খপ করিয়া তার হাত ধরিয়া ফেলে।

'বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'জলটা আনি ?' রাণীর মাথা ঘুরিতে থাকে। তাকেই কি কৈফিয়ৎ দিতে হইবে কেন আজ তার চোখ অন্যদিনের মত নয়, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে চোখ কেন আজ তার এমন বিশ্রী দেখাইতেছে ?

'জল পরে এনো। আগে আমার কথা শুনে নাও।'

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবারও নাই। কাঠের টেবিলটিতে

দু'হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রাণী নীরবে বিকাশের কথার প্রতীক্ষা করে। কি নিষ্ঠুর বিকাশ! এই মানুষটাকে সে এতদিন এত কোমল, এত হৃদয়বান মনে করিয়াছিল!

বিকাশ বলে, 'ভেবেছিলাম আজ বলব না। তোমার শরীর ভাল নয়, আজ বলা উচিত হবে না। কিন্তু তোমার চোখ দেখে আর না বলে থাকতে পারছি না রাণী। তোমার চোখ দেখে রোজ অবাক হয়ে যাই, কিন্তু আজ এমন আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার চোখ—'

রাণী কাতরভাবে বলিল 'কেন ঠাট্টা করছেন ?'

যাই হোক, রাণীর সমস্যা মিটিয়া গেল। পড়া ছাড়িয়া রাণী তার সংসারে গৃহিণী হইতে রাজী হইবে কিনা ভাবিয়া বিকাশের বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। রাণী রাজী হওয়ায় সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তারপর এ রকম অবস্থায় নারী ও পুরুষ যে সব কথা বলাবলি করে, অনেকক্ষণ সে সব কথা বলাবলির পর বিকাশ গেল বাড়ী।

আর রাণী ছুটিয়া গেল নিজের ঘরে। সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র কাকীমা রান্নাঘর হইতে ডাক দিলেন তীব্র ধমকের সুরে, সে সাড়াও দিল না। ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া মুখের সামনে ধরিল প্রসাধনের ছোট আয়নাটি। চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বেদনার্ত স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় চোখে যে কালি পড়ে, কাজলের চেয়ে তা তো কম সুন্দর করে না মানুষের চোখকে! কি রহস্যময় মনে হইতেছে তার চোখ দুটিকে!

নিজের চোখ দেখিয়া রাণী নিজেই যেন মোহিত হইয়া যায়!

আততায়ী

স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত আছে, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শাস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহারক আততায়ী।

অগ্নিকাণ্ডটি হইয়াছিল বেশ বড় রকমের। দিবাকর ও কৃত্তিবাস দুজনেই তখন ছেলে মানুষ। মফঃস্বলের এক সহরে একটা পানাভরা পুকুরের দুই তীরে দু'টি বাড়ীতে তারা বাস করিত। দক্ষিণের চার ভিটায় চারখানা ছোট ছোট ঘরের ছোট বাড়ীতে থাকিত দিবাকর এবং উত্তরের সাত আট ভিটায় ছোট বড় সাত আটটি ঘরের বড় বাড়ীতে থাকিত কৃত্তিবাস ।

কৃত্তিবাসের বাবা ধনদাস লোকটা ছিল বড় রোগা আর বড় রাগী। মেজাজ তার সব সময়েই গরম হইয়া থাকিত। ইদানীং কতকগুলি সাংসারিক হাঙ্গামায়, সে মেজাজে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল অনেক বেশী। একদিন তাই বেলা এগারটার সময় স্কুলে যাওয়ার বদলে রান্নাঘরের পিছনে ডোবার ধারে একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দিবাকরের আবিষ্কৃত নূতন বেজা ধরা ফাঁদটি পাতিতে দু'জনকে খুব ব্যস্ত দেখিয়া মারিতে মারিতে দুইজনকেই প্রায় আধ মরা করিয়া ফেলিল। দিবাকর ছিল কাঠির মত সরু সাপের মত ভীরু আর চড়ুই পাখীর মত কোমল, একটি চড়েই সে আধ মরা হইয়া গেল। কৃত্তিবাসকে আধমরা করিতে দুর্বল ধনদাসের হাঁফ ধরিয়া গেল।

স্কুল দু'জনে আগেও অনেকবার ফাঁকি দিয়াছে, সেদিন কিন্তু সত্যই স্কুলের ছুটি ছিল। তবে কিনা বিচারে শাস্তি দিবার অধিকারটা দেশের বিদেশী সৎ-বাপের চেয়ে ঘরের ছেলের ঘরোয়া আপন বাপের বেশী

থাকাটা অন্যায় নয়, তাই শাসনটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই জানিবার পরেও ছেলেকে একটা চড় ফাউ দিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে ধনদাস চলিয়া গেল।

খানিক পরে কৃত্তিবাস বলিল, 'রোজ সবাই মারে, কিছু করলেও মারে না করলেও মারে। চল আমরা বাড়ী ছেড়ে পালাই।'

কৃত্তিবাসের দু'চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল, ঠোঁট দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। দিবাকরের মসৃণ তেলতেলা গালে শুধু দু'টি আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে। জলে ভরা চোখের স্তিমিত দৃষ্টিতে ডোবার ওপাড়ে একটা গো-সাপের চালচলন দেখিতে দেখিতে বয়স্ক মানুষের মত মাথা হেলাইয়া বন্ধুর প্রস্তাবে সায় দিয়া সে বলিল, 'আমার মামা-বাড়ীতে একটা চাকর ছিল, বাজারের পয়সা চুরি করেছে বলে মামা একদিন এমনি করে মেরেছিল চাকরটাকে। সেদিন সত্যি পয়সা চুরি করেনি। রাত্তির বেলা চাকরটা পালিয়ে গেল, যাবার আগে করল কি জানিস, ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে গেল। এমন জব্দ হয়ে গেল মামা!'

শুনিয়া কৃত্তিবাস বলিল, 'আমিও চালে আগুন দিয়ে পালাব।'

দিবাকর সায় দিয়া বলিল, 'তাই উচিত। যা রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে আয়।'

উনানের একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে করিয়া কৃত্তিবাস ফিরিয়া আসিলে দিবাকর কাঠটা তার হাত হইতে নিজে গ্রহণ করিল।

'আমায় দে। নিজেদের বাড়ীতে নিজে আগুন ধরাতে নেই।'

শীত তখন সবে শেষ হইয়াছে, ঘরের চালাগুলি যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার জন্য এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আগুন লাগিলে নাকি তার বন্ধু বাতাস আসিয়া জোটে।

আগুনের বন্ধুটি সেদিন অনেক আগে হইতেই আধ-শুকনো পাতা-ঝরানোর মত জোরালো অস্তিত্ব নিয়া উপস্থিত ছিল। বাতাসের জন্যই উত্তরে ছোট ডোবার ওপাশের বাড়ীগুলি বাঁচিয়া গেল, কিন্তু দক্ষিণে অতবড় পুকুর ডিঙ্গাইয়া আগুন ধরিয়া উঠিল দিবাকর ও তাদের প্রতিবেশীর বাড়ী চালায়। তারপর লাফাইয়া লাফাইয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল এক চালা হইতে আরেক চালায়। দিবাকর ও কৃত্তিবাসের মনের আগুন নিভিয়া গিয়াছিল গোড়ার দিকেই, চারিদিকে ছুটাছুটি হৈ চৈ ও আর্তনাদের মধ্যে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দু'জনে দাঁড়াইয়া রহিল পুকুরে পূব দিকে একটা জাম গাছের নীচে এবং আগুনের সেই ব্যাপক ও বিরাট মনোহর রূপ দেখিয়া মাঝে মাঝে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

উনান হইতে আগুন সংগ্রহের সময় কৃত্তিবাসের মাসী রান্না করিতেছিল। সেদিনটা সে কোনরকমে চুপ করিয়া রহিল, পরদিন সকালে ধনদাসের কাণে কাণে কথাটা ফাঁস না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। তখনও ভিটায় ভিটায় স্তূপাকার ছাই ও কয়লার মধ্যে শিখাহীন আগুন গুমরাইয়া গুমরাইয়া জ্বলিতেছে। মোটা একটা জ্বলন্ত বাঁশ তুলিয়া ধনদাস পাগলের মত ছেলের মুখে বুকে পিঠে যেখানে পারিল চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

দিবাকর তখন সেখানে ছিল না। একটা গাছতলায় ছড়ানো জিনিষপত্রের মধ্যে বসিয়া সে তখন ধীরে সুস্থে মুড়ি চিবাইতেছিল। দিবাকরের বাবা নিবারণ খুব সাবধানী ও হিসাবী মানুষ, ধনদাসের রান্নাঘরের চালাটা জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি ঘরের জিনিষ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তবে একথাও সত্য যে, নিবারণ ধনদাসের মত বড়লোক নয়।

কৃত্তিবাসের বাঁ চোখটি নষ্ট হইয়া গেল, বাঁ গালটা ঘষা পয়সার মত মসৃণ হইয়া একটু কুঁচকাইয়া গেল। বুকে তিনটি ছোট ছোট এবং পিঠে একটা পোড়া ঘায়ের দাগ চিরস্থায়ীভাবে আঁকা হইয়া গেল। কৃত্তিবাসের জন্য আর কোন শাস্তির ব্যবস্থা হইল না। তার দেওয়া আগুনেই তার চোখটা কাণা হইয়া গিয়াছে আর গায়ে যথেষ্ট ছ্যাঁকা লাগিয়াছে বলিয়াই শুধু নয়, কে বলিতে পারে শাসন করিলেই ছেলেটা আবার কি করিয়া বসিবে? কথাটা ভাবিলেই বাড়ীর লোকের হৃৎকম্প হয়। নিজের বাড়ীতে আগুন যে দিতে পারে সে কি দা' দিয়া মানুষের গলা কাটিয়া ফেলিতে পারে না, লাঠি দিয়া মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে না?

কাজ চালানোর জন্য নিবারণ একখানা এবং ধনদাস চারখানা ঘর তুলিল। যে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল একে একে আবার সেগুলি কেনা হইতে লাগিল। কিন্তু ধনদাসের বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব অনেক, ঘরে কুলায় না, বিছানাপত্রে কুলায় না, থালাবাটিতে কুলায় না। খরচ আর অসুবিধা কৃত্তিবাসের উপর সকলের ক্রোধ ও বিরাগ দিনের পর দিন বাঁচাইয়া রাখে। অন্য রকম শাসন করার সাহস তো কারো নাই, সকলে তাই সব সময়ে তাকে খোঁচায়, গাল দেয় আর অভিশাপ দেওয়ার মত সমালোচনা করে। এক ডজন কাঁসার থালা কিনিয়া আনিয়া ধনদাস বলে, 'প্রথমে যদি কেউ বলত ওই লক্ষ্মীছাড়া আগুন দিয়েছে, ওকে আমি অগুনে পুড়িয়ে মারতাম।' নতুন থালায় ভাত বাড়িয়া ছেলের সামনে ফেলিয়া দিয়া মা বলে, 'নে গেল। এত লোক মরে তোর মরণ হয় না?'

দিবাকর চুপচাপ দাঁড়াইয়া সব দেখিয়া আর শুনিয়া যায়। জল

আসে কৃত্তিবাসের কাণা চোখে, কিন্তু মানুষের মমতা হয় দিবাকরের মসৃণ কোমল মুখে ঘন বিষাদের ছাপ আর বড় বড় চোখের অসহায় ভীরু দৃষ্টি দেখিয়া।

দিবাকর বলে, 'আয়।'

আমবাগানের ছায়ায় বসিয়া কৃত্তিবাস অনর্গল কথা বলে আর দিবাকর চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

শেষে কৃত্তিবাস বলে, 'আগুন দিয়ে পালাবি বলেছিলি যে ?'

দিবাকর সায় দিয়া বলে, 'বলে তো ছিলাম, কোথায় পালাবি ?'

'কলকাতায় পিসীর বাড়ীতে গেলে হয় না ?'

'তাই চ'।'

পরদিন কৃত্তিবাস তার পিসীর কাছে পলাইয়া গেল। সঙ্গে গেল দিবাকর।

পিসী সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিল, 'আয় বাবা আয়। ঘরে কি আগুন দিতে আছে বাবা ? কি সর্ব্বনাশটা করলি বল্ দিকি! কত উঁচুতে উঠেছিল রে আগুন ? কতকাল আগুন দেখিনি, সেই ছেলেবেলা একবার দেখেছিলাম বিয়ের আগে, কান্তিদের বড় ঘরটায় লেগেছিল। আমি তো ভয়েই মরি, আমাদের বাড়ীতে যদি লাগে। তা ভাল করে জ্বলতে না জ্বলতে সবাই মিলে আগুন নিভিয়ে দিল। কিন্তু কি চেহারাটাই তোর হয়েছে বাসু, দেখলে যে ভয় করে রে! দাদা সত্যি মানুষ নয়, এমন করে নিজের ছেলেকে কেউ পোড়াতে পারে! রাগলে দাদা যেন চণ্ডাল হয়ে যায়।' কৃত্তিবাসকে কাছে টানিয়া একবার শুধু তার মাথায় হাত বুলাইয়া পোড়া গালের শুকনো ক্ষত আঙ্গুলে স্পর্শ করিয়া শিহরিতে শিহরিতে পিসী বলিল, 'খবর না দিয়ে এলি, পালিয়ে এসেছিস বুঝি ? দাদাকে তো একটা তার করে দিতে

হয়! ওগো শুনছ, ছুটে একবার পোষ্টাপিসে যাও, দাদাকে একটা তার করে দাও বাসু এখানে এসেছে, আর—'এতক্ষণে ভাল করিয়া দিবাকরের মুখের দিকে চাহিয়া পিসী চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলিল, '—তোমার নাম কি বাছা? দিবাকর?' দুজনে পিসীর কাছেই স্থায়িভাবে থাকিয়া গেল। দিবাকর কেন থাকিয়া গেল কৃত্তিবাসের পিসী অথবা পিসেমশায় ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তাকে এখানে থাকিতে দিয়া তার লেখাপড়া ভরণ পোষণ সেবাযত্নের ভারটাই বা এতখানি খুসী মনে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া নিতেছে কেন তাও তাদের মাথায় ঢুকিল না। প্রথম দিকে একবার কথা উঠিয়াছিল দিবাকরের ফিরিয়া যাওয়ার, পিসী তখন বলিয়াছিল 'থাক না এখন তাড়াহুড়োর কি আছে!' কিছুদিন পরে পিসেমশায় আবার যখন ভাসা ভাসাভাবে কথাটা তুলিল পিসী স্পষ্টই বলিয়া দিল, 'না, দিবু যাবে না। ওকে তাড়াবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন?'

পিসেমশায় আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'তাড়াবার জন্য নয়। ওর বাপ মা রাগ করতে পারে, তাই বলছিলাম।'

পিসী হাসিয়া বলিল, 'রাগ করবে না ছাই করবে। অ্যাদ্দিনের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ছেলের খোঁজ নিল না, রাগ করবে। বাসু যায় তো যাক, দিবু যাবে না।'

পিসীর মেজাজটা একটু খাপছাড়া কিন্তু গরম নয়। চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সে উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা ঝকঝকে দাঁত বাহির করিয়া অনায়াসে হাসিতে পারে, রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও মিষ্টি কথা বলিতে পারে! কেবল পারে না মানুষকে ধমক দিতে বা শাসন করিতে। শুষ্ক শীর্ণ শরীরে তার জোর নাই, শুধু আছে মুখের অনর্গল কথার ছন্দে ক্রমাগত হাত নাড়ার ছটফটানি; দুর্বল মনে তার

তেজ নাই, শুধু আছে একটা অস্বাভাবিক ভোঁতা আনন্দের অফুরন্ত উত্তেজনা।

দিবাকরের আদর পিসীর কাছে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মানুষ কি সব সময় মনে রাখিতে পারে মুখপোড়া কাণা ছেলেটাই তার দাদার ছেলে আর অন্য ছেলেটা তার কেউ নয় এবং কথাটা মনে রাখিয়া পরের যে ছেলেটাকে দেখিয়া বাৎসল্য উথলিয়া ওঠে তার বদলে সর্বদা আদর করিতে পারে দাদার ছেলেকে? সুতরাং পিসীর কোন দোষ নাই।

পিসী যে দিবাকরকে ভালবাসিয়াছে, কৃত্তিবাস তাতেই যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তা ছাড়া, দিবাকরের আদর বাড়িয়াছে বলিয়া কৃত্তিবাসের অনাদর তো বাড়ে নাই, পিসীর কাছে কৃত্তিবাস তাতেই খুসী হইয়া রহিল! এখানে কেউ যে তাকে খোঁচায় না, গাল দেয় না, অভিশাপ দেওয়ার মত তার কথা আলোচনা করে না, তাই যথেষ্ট। কাঁটার বিছানা হইতে তুলিয়া ছেঁড়া কম্বলে শোয়াইয়া দিলেই ছোট ছেলে আরাম পায়, গদিতে গড়ানোর সুখে বঞ্চিত হওয়ার অভিমানে হয়তো কদাচিৎ ছেঁড়া কম্বলে মুখ গুঁজিয়া একটু কাঁদে, তাও অল্পক্ষণের জন্য।

এমনিভাবে দিন কাটিতে লাগিল। দিবাকর ও কৃত্তিবাসের বাড়ী হইতে মাঝে মাঝে তাগিদ আসিতে লাগিল, কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাইতে। মা নাকি তাদের বড় কাঁদে। দিবাকরকে বাড়ী যাইতে দিতে পিসীর বড়ই অনিচ্ছা দেখা গেল।

তোর গিয়ে কাজ নেই, বাড়ী গেলেই ফের তোকে ম্যালেরিয়া ধরবে। বাসু যদি যায় তো যাক দু'দশদিনের জন্য।

কিন্তু বাড়ী যাইতে কৃত্তিবাসের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না।

বাড়ীর কথা ভাবিলে এখনও তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়, পোকায় কাটা দাঁতের মত গাল আর বুক ও পিঠের পোড়া দাগের জায়গাগুলি শির্ শির্ করে, ধোঁয়া লাগার মত কাণা চোখ জ্বালা করে। সাত আট বছরের মধ্যে তাই দু'জনের একজনও বাড়ী গেল না। দিবাকর গেল না পিসীর অনিচ্ছায়, কৃত্তিবাস গেল না নিজের অনিচ্ছায়।

তারপর একদিন একটা কড়া তাগিদ আসিল ধনদাসের কাছ হইতে। ধনদাস শুধু বাড়ী যাওয়ার তাগিদ দেয় নাই, আরও অনেক কড়া কথা লিখিয়াছে।

কৃত্তিবাস বলিল, 'এবার কি করি?'

দিবাকর বলিল, 'বাড়ী যা। সেই যে শৈলেন ছেলেটা পড়ত না আমাদের সঙ্গে, সেও এমনি করে বাপকে চটিয়েছিল, মরবার সময় ওর বাবা ওকে একটি পয়সা দিয়ে যায় নি। কাকাবাবুর কথা শুনে চলিস বুঝলি?'

কৃত্তিবাস বলিল, 'তুইও আয় না?'

দিবাকর বলিল, 'থাক গে, পিসীমা আবার রাগ করবে।'

সুতরাং কৃত্তিবাস একাই বাড়ী চলিয়া গেল। কয়েকদিন মুখ ভার করিয়া থাকিয়া পিসী হঠাৎ একদিন দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও বাপের টাকা পাক বা না পাক, তা দিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে দিবু?'

দিবাকর এখন বড় হইয়াছে, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে, এখন আর তাকে দেখিলে আগের মত ততটা মনে হয় না যে, কাদের বাড়ীর সে হারানো ছেলে, এখুনি বুঝি মুখে আঙ্গুল দিয়া মার জন্য কাঁদিয়া ফেলিবে। আজকাল আর তেমনভাবে পিসীর বুকে বাৎসল্য উথলাইয়া উঠে না। কেবল ব্রণের দাগ বা গোঁফদাড়ির চিহ্নহীন

তার বালকের মত কোমল তেলতেলা মুখ আর বড় বড় চোখের দুশ্চিন্তাভরা দৃষ্টি দেখিয়া প্রত্যেকবার অভ্যস্ত মমতাটা জোরে নাড়া খায়।

দিবাকর কিছুই বলিল না, শুধু আহত বিস্ময়ে পিসীর দিকে চাহিয়া রহিল, যে দৃষ্টি দেখিয়া পিসীর সাধ হইতে লাগিল তার বাদামী রঙের গালে একটা চুমা খাইয়া কাণে কাণে বলে, 'ষাট্ ষাট্ সোণা আমার!' তবে রোগে ভুগিতে ভুগিতে আরও শুকাইয়া গিয়া পিসীর মেজাজটা আজকাল একটু খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাই সাধটা দমন করিয়া আবার বলিল, 'ওকে পাঠিয়ে দিলি, নিজে তুই গেলি না। মা না তোর খুব কাঁদে তোর জন্য? মাকে কাঁদিয়ে তুই পড়ে আছিস আমার কাছে, এতই তুই ভালবাসিস আমাকে!'

দিবাকর এবারও কিছু বলিল না। বেশীক্ষণ পিসীর উত্তেজনা সহ্য হয় না, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঝিমঝিম করে। এবার তাই হার মানিয়া পিসী দিবাকরের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, দু'হাতে তাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পিসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'আমি কি জানি না তুই কেন আছিস আমার কাছে! আমার জন্যে তোর এক ফোঁটা মায়া নেই। তোকে চিনতে কি আমার বাকী আছে রে মুখপোড়া ছেলে!'

পিসী একটু শান্ত হইলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, 'একবার বাড়ী যাবে নাকি পিসী?'

পিসী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু।'

'যাই না একবারটি? দু'দিনের জন্য?'

'না। একেবারে আমার চিতায় অগুন দিয়ে যাস।'

আদেশটা দিবাকর পালন করিতে পারিল না। কয়েক মাস

পরে যদিও পিসীর চিতায় আগুন দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল সে কাজটা করিল কৃত্তিবাস, তার মেসের বাসা হইতে আসিয়া। দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে কৃত্তিবাসকে পিসী বাড়ীতে উঠিতে দেয় নাই।

কয়েকদিনের জন্য বাড়ী গিয়া কৃত্তিবাস ফিরিতে বড় দেরী করিতেছিল। একদিন ধনদাসের একখানা চিঠি আসিল, সে অবিলম্বে ছেলের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছে, পিসী যেন অবিলম্বে যায়। চিঠি পড়িয়াই পিসী তো রাগিয়া আগুন, পিসীকে এমনভাবে রাগিতে দিবাকর আর কখনো দেখে নাই।

'অ্যাতো বচ্ছর খাওয়ালাম পড়ালাম মানুষ করলাম ছেলের মত, বিয়ের সব ঠিক করে আমায় শুধু নেমন্তন্ন! কুটুমের মত নেমন্তন্ন! একবার জানানো দরকার মনে করল না কোথায় বিয়ে কি বৃত্তান্ত, একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করলে না আমাকে!'

কৃত্তিবাসের বিশেষ দোষ ছিল না। দিবাকর অবশ্য তাকে বিবাহ করিতে বিশেষতঃ গেঁয়ো একটা মূর্খ মেয়েকে বিবাহ করিতে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকবার বারণ করিয়াছিল, কিন্তু এদিকে আবার বাড়ী যাওয়ার সময় বলিয়াও দিয়াছিল, বাপকে যেন সে না চটায়। দিবাকর এখন কাছেও ছিল না যে জিজ্ঞাসা করিয়া একটু মনের জোর ধার করিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

দুমাস পরে সে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পিসীর বাড়ীতে উঠিল না। পিসী আগেই অতি স্পষ্ট ভাষায় একখানা পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিয়াছিল তার বাড়ীতে কৃত্তিবাসের আর ঠাঁই হবে না।

দিবাকর বন্ধুর বিবাহে যায় নাই, পিসীর অনুমতি ছিল না। কৃত্তিবাস কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া পিসী দিবাকরকে বারণ

দিনের, আজ তার মনে হইল এ লজ্জা আর অপরাধের ভঙ্গিটা কেমন যেন নূতন ধরণের। কিছুদিন দেশের বাড়ীতে কাটাইয়া কৃত্তিবাস যেন সচেতন অভিনয়ের বিদ্যা আয়ত্ব করিয়া আসিয়াছে।

টাকাও কৃত্তিবাস আনিয়াছিল অনেক, কিন্তু হিসাবের চেয়ে অনেক কম। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কমপক্ষে কতটাকা পাওয়া উচিত, বাড়ী যাওয়ার আগে কৃত্তিবাসকে সে কথাটা দিবাকর ভালভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছিল। কথা বলিতে গিয়া কৃত্তিবাস ঢোক গিলিল তিনবার, তারপর বলিল, 'সব বিক্রি করিনি ভাই। কয়েকটা সম্পত্তি থেকে বেশ আয় হয়, তা ছাড়া সবাই বলল সম্পত্তি থাকলে থাকে, টাকা খরচ হয়ে যায়। তা ছাড়া, আমি ভাবলাম অত টাকা তো লাগবে না—'

এবার পরিচিত ভঙ্গিতেই অপরাধী কৃত্তিবাস ঘন ঘন ঢোক গিলিতে লাগিল আর এক হাত দিয়া কচলাইতে লাগিল তার আরেকটা হাত, মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল দিবাকর একটা কড়া কথা বলিলেই সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে। দেখিয়া খুশী হইয়া দিবাকর তাই তাকে আর কিছুই বলিল না, নিজের বড় শয়ন ঘরটি খালি করিয়া কৃত্তিবাস আর তার বৌয়ের শয়ন ঘরে পরিণত করার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কৃত্তিবাসের হুকুমে ইতিমধ্যেই দিবাকরের সামনে মহামায়ার ঘোমটা কপালের যেখানে কৃত্তিবাসের অনুরোধে এখন সে আলপিনের মাথায় সিঁদুর লাগাইয়া প্রায় অস্পষ্ট কোঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছে সেখানে উঠিয়া গিয়াছিল। একপাশে প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া সে অবাক হইয়া দিবাকরকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। শ্বশুর নয়, ভাসুর নয়, দেবর নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয় পর্য্যন্ত নয়, শুধু তার স্বামীর বন্ধু,

তবু সেই যেন সব। ব্যবস্থা করিতেছে সে, হুকুম দিতেছে সে, দোষ ধরিতেছে সে, চাকর ঠাকুরকে ধমক দিতেছে সে। সে যেন এ বাড়ীর আশ্রিত নয়, তার বাড়ীতেই যেন সস্ত্রীক বেড়াইতে আসিয়াছে তার বন্ধু।

রাত্রে মহামায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ওঁকে এত ভয় কর কেন ?'

কৃত্তিবাস অবাক হইয়া বলিল, 'ভয় কবি ? ভয় আবার করলাম কখন ?' মহামায়া হাসিয়া ফেলিল, 'মানুষটার ভয়ে সব সময় কেঁচো হয়ে আছ, আর বলছ ভয় করলে কখন !' তারপর হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, 'যাই বল, তোমার ব্যাপারট্যাপার কিছু বুঝিতে পারছি না বাপু। তোমার বাড়ীঘর, খেতে পরতে দিচ্ছ তুমি, তোমার টাকা নিয়ে বাবুয়ানা করে বেড়াচ্ছে, আর ওর ভয়ে তুমি নিজে যেন চোর হয়ে আছ তোমার নিজের বাড়ীতে !'

শুনিয়া কৃত্তিবাস চোখ বড় করিয়া খানিক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কি যে বল তুমি ! ভয় করব কেন, ছেলেবেলার বন্ধুতো, মনে কষ্ট লাগবে বলে একটু সামলে সুমলে চলি।'

মহামায়া বলিল, 'ভদ্রলোককে বলে দেওনা এবার, তোমার ঘাড না ভেঙ্গে কোথাও থাকুন গিয়ে ?'

কৃত্তিবাস বিবর্ণ মুখে বলিল, 'ছিঃ, তাই কি বলা যায়।'

আরেকদিন বলবে ভাবিয়া, প্রথমদিন কথাটা তুলিয়াই বেশী কিছু বলা ভাল নয় ভাবিয়া, তখনকার মত মহামায়া চুপ করিয়া গেল। চেষ্টা করিয়া কৃত্তিবাসের বিবর্ণ মুখে মুগ্ধ মনের ভোঁতা জ্যোতিও ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু অনেকদিন পরে ফিরিয়া পাওয়া স্বামীর

সোহাগে যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ স্বাদ অনেকদিনের বঞ্চিতা ও অবহেলিতা স্ত্রী পায়, গত দুমাস যে স্বাদ পাইয়া মহামায়ার রাত্রিগুলি ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, আজ যেন সেটা কোনমতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার স্বামীর ঘাড় ভাঙ্গে বলিয়া দিবাকরের উপর রাগ হওয়ার বদলে ঘাড় ভাঙ্গিতে দেয় বলিয়া কৃত্তিবাসের বিরুদ্ধেই একটা অসহায় ক্ষোভ সারাক্ষণ মনের মধ্যে গুমরাইতে লাগিল।

তারপর একে একে অনেকগুলি রাত্রি আসিয়া চলিয়া গেল, তুলিয়া রাখা কথাটা মহামায়ার আর পাড়া হইল না। প্রথমদিকের কয়েকটা রাত্রে ভাবিল, ক'দিন পরে কথাটা তুলিব, তারপর আরও কতগুলি রাত্রি কাটিয়া যাওয়ার পর ভাবিতে লাগিল, কি আর হইবে ওকথা তুলিয়া!

সেবা সে করিতে লাগিল দু'জনের, ম্লান গম্ভীর মুখে। ডাল তরকারী মাছের ঝোলে স্বাদ আসিল, হঠাৎ একদিন ময়লা জামা কাপড়ের স্তূপ ঘাঁটিয়া কাজ চালানো গোছের ফর্সা জামা কাপড় খুঁজিবার প্রয়োজন মিটিয়া গেল, ঘরদুয়ার হইল সাজানো গুছানো পরিষ্কার।

ঘরে তৈরী নিমকি সিঙ্গাড়া মুখে দিয়া চা খাইতে খাইতে দিবাকর বলিতে লাগিল, 'আগে তোমাকে আনানো হয়নি বলে কি আফশোষটাই যে হচ্ছে এখন!'

আর মৃদু হাসিয়া কৃত্তিবাস বলিতে লাগিল, 'তুই বললেই আনতাম। ওতো আসবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিল।'

আর দিবাকরের পলকহীন স্তিমিত দৃষ্টিপাতে স্বামীর খাপছাড়া মন্তব্যের একটা লাগসই জবাব দিবার উপক্রম করিয়াও মহামায়া চুপ করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন দিবাকর বলিল, 'তোর চোখটা যে বড় বেশী লাল দেখাচ্ছে বাস্থ ?'

কৃত্তিবাস বলিল, 'চোখ তো আমার মাঝে মাঝে লাল হয় আর জ্বালা করে। এ চোখটার জন্য কোন নার্ভাস রিয়্যাকসন হয় বোধ হয়।'

দিবাকর বলিল, 'না, সে রকম নয়। আয়তো দেখি।'

অনেকক্ষণ দিবাকর তার চোখটি পরীক্ষা করিল, পিসীর হার্ট পরীক্ষা করার চেয়ে অনেক বেশী সময় আর মনোযোগ দিয়া। তারপর মুখখানা সেদিনের চেয়ে আরও বেশী গম্ভীর করিয়া বলিল, 'তুই না ডাক্তারি পাশ করেছিস ? তুই না ডাক্তার !'

কৃত্তিবাস সভয়ে বলিল, 'কি হয়েছে ?'

দিবাকর আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, 'এখনো বুঝতে পারছিস না ?'

কৃত্তিবাস লজ্জা পাইয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, 'পারছি। আমারও একটু একটু যেন সন্দেহ হচ্ছিল।'

দিবাকর রাগ করিয়া বলিল, 'সন্দেহ হচ্ছিল তো বললে না কেন ? এত যে দেরী হয়ে গেল এখন—যাকগে! কি আব হবে তোকে এসব বলে !'

কৃত্তিবাস কোনদিন দিবাকরকে রাগ করিতে দেখে নাই। সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

দিবাকর অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'কলেজের হাসপাতালে যাবি ?'

কৃত্তিবাস কাতরভাবে বলিল, 'ধেৎ, তুই থাকতে কলেজের হাসপাতালে কেন যাব ?'

এক ঘণ্টার মধ্যে দিবাকর তার চোখে অস্ত্র করিল। মহামায়া রান্নাঘরে দিবাকরের প্রিয় খাদ্য পায়েস করিতে বড় ব্যস্ত ছিল, কড়াই নামাইয়া উপরে গিয়া সে দেখিল, তার কাণা স্বামীর ভাল চোখটিও ব্যাণ্ডেজে ঢাকা পড়িয়াছে। নিজের চোখ দুটি আক্রমণোদ্যত বাঘিনীর চোখের মত করিয়া সে দিবাকরের দিকে চাহিয়া রহিল।

দিবাকর নির্বিকার সহজভাবে বলিল, 'সময় মত বলেনি, কি হয় এখন কে জানে!'

সুতরাং কৃত্তিবাস অন্ধ হইয়া গেল।

তারপর একদিন সকালে নীচের ঘরের অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ঝিমানোর বদলে উপরে নিজের শোয়ার ঘরের অন্ধকারে আরাম করিয়া শুইয়া শুইয়া ঝিমানোর সাধ জাগায় অন্ধ কৃত্তিবাস হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যেই ঘরের দরজার কাছে গিয়াছে, দু'টি কাণে যেন তার পুরুষ ও নারী কণ্ঠের ফিসফিসানির বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়া গেল। খানিকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল বজ্রাহতের মতই, তারপর ফিরিয়া গেল নীচে। পা-ফসকাইয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া গেল, তবু সে থামিল না। অন্ধ মানুষের একা একা এ জগতে বিচরণ করা সম্ভব নয় টের পাইয়া একা বাহির হইয়া যাওয়ার বদলে শুধু সঙ্গে নিল চাকরটাকে।

কোথায় গেল কৃত্তিবাস ভগবান জানেন, কিছুকাল পরে দিবাকরের নামে ডাকে শুধু আসিল একটি দলিল। ভাল আয় হয় বলিয়া পরের পরামর্শে যেসব জমিজমা কৃত্তিবাস বিক্রয় করে নাই, সেগুলি সে দিবাকরকে দান করিয়া দিয়াছে। একে অবশ্য ঠিক দান বলে না, এ একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিশোধের চাল মাত্র। দিবাকরের মত মানুষদের উপর কৃত্তিবাসের মত মানুষরা চিরকাল এইরকম চাল খাটাইয়া আসিতেছে।

বিবেক

শেষ রাত্রে একবার মণিমালার নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। শিয়রে ঘনশ্যাম অত্যন্ত সজাগ হইয়াই বসিয়াছিল। স্ত্রীর মুখে একটু মকরধ্বজ দিয়া সে বড় ছেলেকে ডাকিয়া তুলিল।

'ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় সন্তু। নিখিলবাবু যদি না আসেন, মোড়ের বাড়িটাতে যে নতুন ডাক্তার এসেছেন, ওঁকে আনিস্। উনি ডাকলেই আসবেন।'

ঘরে একটিও টাকা নাই, শুধু কয়েক আনা পয়সা। ভিজিটের টাকাটা ডাক্তারকে নগদ দেওয়া চলিবে না। বাড়িতে ডাক্তার আনিলে একেবারে শেষের দিকে বিদায়ের সময় তাকে টাকা দেওয়া সাধারণ নিয়ম, এইটুকু যা ভরসা ঘনশ্যামের। ডাক্তার অবশ্য ঘরে ঢুকিয়াই তার অবস্থা টের পাইবেন, কিন্তু একটি টাকাও যে তার সম্বল নাই এটা নিশ্চয় তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হইবে না। মণিমালাকে ভালভাবেই পরীক্ষা করিবেন, মরণকে ঠেকানোর চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না। বাঁচাইয়া রাখার জন্য দরকারী ব্যবস্থার নির্দেশও তাঁর কাছে পাওয়া যাইবে। তারপর, শুধু তারপর, ঘনশ্যাম ডাক্তারের সামনে দুটি হাত জোড় করিয়া বলিবে, 'আপনার ফি'টা সকালে পাঠিয়ে দেব ডাক্তারবাবু—'

মণিমালার সামনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতজোড় করিয়া বিড়বিড় করিয়া কথাগুলি বলিতেছে। ঘুমভরা কাঁদ কাঁদ চোখে বড় মেয়েটা তাকে দেখিতেছে। আঙ্গুলে করিয়া আরও খানিকটা মকরধ্বজ সে মণিমালার মুখে গুঁজিয়া দিল। ওষুধ গিলিবার ক্ষমতা অথবা চেষ্টা

মণিমালার আছে, মনে হয় না। হিসাবে হয়তো তার ভুল হইয়া গিয়াছে। আরও আগে ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো উচিত ছিল। ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না, ডাক্তারের প্রাপ্য সে দু'চার দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে, মণিমালা মরুক অথবা বাঁচুক। তবু, গোড়ায় কিছু না বলিয়া রোগিণীকে দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা আদায় করার হিসাবে একটু প্রবঞ্চনা আছে বৈকি। এসব হিসাবে গলদ থাকিয়া যায়।

কিন্তু উপায় কি! একজন ডাক্তার না দেখাইয়া মণিমালাকে তো মরিতে দেওয়া যায় না।

'আগুন করে হাতে পায়ে সেঁক দে লতা। কাঁদিস নে হারামজাদি, ওরা উঠে যদি কান্না সুরু করে, তোকে মেরে ফেলব।'

মণিমালার একটি হাত তুলিয়া সে নাড়ী পরীক্ষার চেষ্টা করিল। দু'হাতে দু'টি রুলি এখনো তার আছে। সজ্ঞানে এ রুলি সে কিছুতেই খুলিতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যায় জ্ঞান প্রায় ছিল না, তখন একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চোখ কপালে তুলিয়া যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মণিমালাকে খাবি খাওয়ার উপক্রম করিতে দেখিয়া সাহস হয় নাই। এখন অনায়াসে খুলিয়া নেওয়া যায়। সে টেরও পাইবে না। সকালেই ডাক্তারকে টাকা দেওয়া চলিবে, ওষুধপত্র আনা যাইবে। কিন্তু লাভ কি কিছু হইবে শেষ পর্যন্ত? সেইটাই ভাবনার বিষয়। রুলি-বেচা পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্ট ফেল করে!

সন্তু যখন ফিরিয়া আসিল, চারিদিক ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। মণিমালা ততক্ষণে খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। খুঁজিয়া নাড়ী পাওয়া যাইতেছে, নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার আসেন নাই শুনিয়া ঘনশ্যাম আরাম বোধ করিল।

নিখিল ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন, বেলা দশটা নাগাদ আসিবেন। মোড়ের বাড়ীর নতুন ডাক্তারটি ডাকা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে জামা গায়ে দিয়া ব্যাগ হাতে রওনা হইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া সন্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন খোকা?'

'মা মরে যাবে ডাক্তারবাবু।'

'শেষ অবস্থা নাকি?' বলে ডাক্তার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া চারটে টাকার জন্য সন্তুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাছেই তো বাড়ী। তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, টাকা নিয়া গেলেই আসিবেন। সন্তুকে তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন, নগদ চারটে টাকা যদি বাড়িতে নাও থাকে তিনটে কি অন্ততঃ দু'টো টাকা নিয়েও সে যেন যায়। বাকী টাকাটা পরে দিলেই চলিবে।

'তুই কাঁদতে গেলি কেন লক্ষ্মীছাড়া?'

এ ডাক্তারটি আসিলে মন্দ হইত না। ডাক্তারকে ডাক্তার, ছ্যাঁচড়াকে ছ্যাঁচড়া। টাকাটা যতদিন খুসী ফেলিয়া রাখা চলিত। একেবারে না দিলেও কিছু আসিয়া যাইত না। এসব অর্থের কাঙাল নীচু স্তরের মানুষ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের মনে গভীর অবজ্ঞা আছে। এদের একজন তাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, ভাবিলে সে গভীর অস্বস্তি বোধ করে না, মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় না।

ঘরের অপর প্রান্তে, মণিমালার বিছানার হাত তিনেক তফাতে, নিজের বিছানায় গিয়া ঘনশ্যাম শুইয়া পড়িল। ভিজা ভিজা লাগিতেছে বিছানাটা। ছোট মেয়েটা সারারাত চরকির মত বিছানায় পাক খায়, কখন আসিয়া এদিকে তার বিছানা ভিজাইয়া ওপাশে খোকার ঘাড়ে পা তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। মারিবে? এখন মারিলে অন্যায় হয় না। সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিবে ওর

পিঠের ওই পাঁজরায় অথবা লোল ও তুলার আঁশ মাখানো গালে? আধঘণ্টা ধরিয়া চীৎকার করিবে মেয়েটা। মণিমালা ছাড়া কারো সাধ্য হইবে না সহজে ওর সেই কান্না থামায়।

আধঘণ্টা মরার মত পড়িয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। অশ্বিনীর কাছেই আবার সে কয়েকটা টাকা ধার চাহিবে, যা থাকে কপালে। এবার হয়তো রাগ করিবে অশ্বিনী, মুখ ফিরাইয়া বলিবে তার টাকা নাই। হয়তো দেখাই করিবে না। তবু অশ্বিনীর কাছেই তাকে হাত পাতিতে হইবে। আর কোন উপায়ই নাই।

বহুকালের পুরানো পোকায় কাটা সিল্কের জামাটি দিন তিনেক আগে বাহির করা হইয়াছিল, গায়ে দিতে গিয়া ঘনশ্যাম থামিয়া গেল। আর জামা নাই বলিয়া সে যে এই জামাটি ব্যবহার করিতেছে, এই জামা গায়ে দিয়া বাজার পর্যন্ত করিতে যায়, অশ্বিনী তা টের পাইবে না। ভাবিবে, বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাক্স প্যাটরা ঘাঁটিয়া মান্ধাতার আমলের পোকায় কাটা দাগ ধরা সিল্কের পাঞ্জাবীটি সে বাহির করিয়াছে। মনে মনে হয়তো হাসিবে অশ্বিনী।

তার চেয়ে ছেঁড়া ময়লা সার্টটা পরিয়া যাওয়াই ভাল। সার্টের ছেঁড়াটুকু সেলাই করা হয় নাই দেখিয়া ঘনশ্যামের অপূর্ব সুখকর অনুভূতি জাগিল। কাল লতাকে সেলাই করিতে বলিয়াছিল। একবার নয়, দু'বার। সে ভুলিয়া গিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত কারণে মেয়েটাকে মারা চলে। ও বড় হইয়াছে, কাঁদাকাটা করিবে না। কাঁদিলেও নিঃশব্দে কাঁদিবে, মুখ বুজিয়া।

'লতা ইদিকে আয়। ইদিকে আয় হারামজাদি মেয়ে!'

চড় খাইয়া ঘনশ্যামের অনুমান মত নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে

সস্তা সার্ট সেলাই করে, আর বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘনশ্যাম আড়চোখে তার দিকে তাকায়। মায়া হয়, কিন্তু আপশোষ হয় না। অন্যায় করিয়া মারিলে আপশোষ ও অনুতাপের কারণ থাকিত।

অশ্বিনীর মস্ত বাড়ির বাহারে গেট পার হওয়ার সময় সবিনয় নম্রতায় ঘনশ্যামের মন যেন গলিয়া যায়। দাসানুদাস, কীটানুকীটের চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। সমস্তক্ষণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে ধনহীনতার মত পাপ আর নাই। রাস্তায় নামিয়া যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ অপরাধের ভারে সে যেন দু'এক ডিগ্রী সামনে বাঁকিয়া কুঁজো হইয়া থাকে।

সবে তখন আটটা বাজিয়াছে। সদর বৈঠকখানার পর অশ্বিনীর নিজের বসিবার ঘর, মাঝখানের দরজায় পুরু দুর্ভেদ্য পর্দা ফেলা থাকে। এত সকালেও বৈঠকখানায় তিনজন অচেনা ভদ্রলোক ধর্না দিয়া বসিয়া আছেন। ঘনশ্যাম দমিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল অশ্বিনীর বসিবার ঘরে। অন্দর হইতে অশ্বিনী প্রথমে এ ঘরে আসিবে।

ঘরে ঢুকিয়াই ঘনশ্যাম সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল ঘরে কেউ নাই। সোনার ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ার পর আরেকবার বিশেষভাবে সে বুঝিতে পারিল ঘর খালি। উনানে বসানো কেটলিতে যেমন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ সুরু হয় এবং খানিক পরে আওয়াজ কমিয়া জল ফুটিতে থাকে, ঘনশ্যামের মাথাটা তেমন খানিকক্ষণ শব্দিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাড়া ছাড়া চিন্তায় টগবগ করিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ড পাঁজরে আছাড় খাইতে সুরু করিয়াছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হাত পা কাঁপিতেছে ঘনশ্যামের। নির্জন ঘরে টেবিল

হইতে তুলিয়া একটা ঘড়ি পকেটে রাখা এত কঠিন! কিন্তু দেরী করা বিপজ্জনক। ঘড়িটা যদি তাকে নিতেই হয়, অবিলম্বে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেরী করিতে করিতে হয়তো শেষ পর্যন্ত সে যখন ঘড়িটা তুলিয়া পকেটে ভরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কেহ ঘরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া ফেলিবে। কেউ না দেখিলে তার কোন ভয় নাই। সদ্‌বংশজাত শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সে, সকলে তাকে নিরীহ ভালো মানুষ বলিয়া জানে, যেমন হোক অশ্বিনীর সে বন্ধু। তাকে সন্দেহ করার কথা কে ভাবিবে! ঘড়ি সহজেই হারাইয়া যায়। চাকর ঠাকুর চুরি করে, সন্ন্যাসী ভিখারী চুরি করে। শেষবার ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছিল মনে পড়িয়াও যেন মনে পড়িতে চায় না মানুষের। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি কোথায় ছিল, কে নিয়াছে, কে বলিতে পারিবে!

তারপর ঘড়িটা অবশ্য এক সময় ঘনশ্যামের পকেটে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাতপায়ের কাঁপুনি থামিয়া তখন নিজেকে তার অসুস্থ, দুর্বল মনে হইতেছে। হাঁটু দু'টি যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। পেটের ভিতর কিসে জোরে টানিয়া ধরিয়াছে আর সেই টানে মুখের চামড়া পর্যন্ত সির সির করিতেছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই ঘনশ্যাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বিনীর পুরাণো চাকর পশুপতি উপস্থিত ভদ্রলোকদের চা পরিবেশন করিতেছে। ঘড়িটা পকেটে রাখিতে সে যে এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছে, ঘনশ্যামের ধারণা ছিল না। হিসাবে একটা ভুল হইয়া গেল। পশুপতি মনে রাখিবে। এ ঘর হইতে তার বাহির হওয়া, তার থমক, চমক, শুকনো মুখ, কিছুই সে ভুলিবে না।

'কেমন আছেন ঘোনোসশ্যামবাবু? চা দিই?'

'দাও একটু।'

ধোপ দুরস্ত ফর্সা ধুতি ও সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। তার চেয়ে পশুপতিকে ঢের বেশী ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে। ঘনশ্যামের শুধু এইটুকু সান্তনা যে আসলে পশুপতি চোর। অশ্বিনী নিজেই অনেকবার বলিয়াছে, সে এক নম্বরের চোর। কিন্তু কি প্রশ্রয় বড়লোকের এই পেয়ারের চোর-চাকরের! এক কাপ চা দেওয়ার সঙ্গে বড়লোক বন্ধুর চাকর যে কতখানি অপমান পরিবেশন করিতে পারে খেয়াল করিয়া ঘনশ্যামের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। আজ কিন্তু প্রথম নয়। পশুপতি তাকে কোনদিন খাতির করে না, একটা অদ্ভুত মার্জিত অবহেলার সঙ্গে তাকে শুধু সহ্য করিয়া যায়। এ বাড়িতে আসিলে অশ্বিনীর ব্যবহারেই ঘনশ্যামকে এত বেশী মরণ কামনা করিতে হয় যে, পশুপতির ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবসর সে পায় না। চায়ে চুমুক দিতে জিভ পুড়াইয়া পশুপতির বাঁকা হাসি দেখিতে দেখিতে আজ সব মনে পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা ভরা অনুযোগ পাক দিয়া উঠিতে লাগিল অশ্বিনীর বিরুদ্ধে। অসহ্য অভিমানে চোখ ফাটিয়া যেন কান্না আসিবে। বন্ধু একটা ঘড়ি চুরি করিয়াছে জানিতে পারিলে পুলিশে না দিক জীবনে অশ্বিনী তার মুখ দেখিবে না সন্দেহ নাই। অথচ প্রথার মত নিয়মিতভাবে যে চুরি করিতেছে সেই চাকরের কত আদর তার কাছে! অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করা অন্যায় নয়। ওরকম মানুষের দামী জিনিষ চুরি করাই উচিত।

একঘণ্টা পরে মিনিট পাঁচেকের জন্য অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইল। প্রতিদিনের মত আজও সে বড় ব্যস্ত হইয়া আছে। মস্ত চেয়ারে মোটা দেহটি ন্যস্ত করিয়া অত্যধিক ব্যস্ততায় মেঘ-গম্ভীর মুখে হাঁসফাশ করিতেছে। ঘনশ্যামের কথাগুলি সে শুনিল কি না বুঝা গেল না।

চিরদিন এমনিভাবেই সে তার কথা শোনে, খানিক তফাতে বসাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া ঘনশ্যামকে দিয়া সে দুঃখ দুর্দশার কাহিনী আবৃত্তি করায়। নিজে কাগজ পড়ে, লোকজনের সঙ্গে কথা কয়, মাঝে মাঝে আচমকা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়াও যায়। ঘনশ্যাম থামিয়া গেলে তার দিকে তাকায়। হাকিম যেভাবে কাঠগড়ায় ছ্যাঁচড়া চোর আসামীর দিকে তাকায় তেমনিভাবে। জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছিলে ?' ঘনশ্যামকে আবার বলিতে হয়।

আজ পাঁচ মিনিটও গেল না, নীরবে ড্রয়ার খুলিয়া পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ডাকিল 'পশু !'

পশুপতি আসিয়া দাঁড়াইলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপড় কাচা সাবান আছে ?'

'আছে বাবু।'

'এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামা কাপড়টা বাড়ীতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরীব বলে কি নোংরা থাকতে হবে ?' পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে এ পর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অন্ততঃ পনেরোটা টাকা দিয়াছে, তার নীচে কোনদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কি অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কি স্পর্ধা! পথে নামিয়া ট্রাম রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যই জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিবে! হয়তো আজ সারাটা দিন, হয়তো কাল পর্যন্ত।

ঘনশ্যামেরও একটা বৈঠকখানা আছে। একটু স্যাঁতসেঁতে এবং ছায়ান্ধকার। তক্তপোষের ছেঁড়া সতরঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে দেহ মন জুড়াইয়া যায়, চোখ আর জ্বালা করে না, ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে হয়। মিনিট পনের ঘনশ্যামের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার পর তার বন্ধু শ্রীনিবাস চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়াছিল। আরও আধঘণ্টা হয়তো সে এমনি ভাবে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু যাওয়ার তাগিদটা মনে তার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ঘনশ্যাম ঘরে ঢোকামাত্র ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভালই হল, এসে পড়েছিস আর এক মিনিট দেখে চলে যেতাম ভাই। ডাক্তার আসলে না ?'

'ডাক্তার ডাকতে যাইনি। টাকার খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

শ্রীনিবাস ক্লিষ্টভাবে একটু হাসিল—'দু'জনেরি সমান অবস্থা। আমিও টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, ওনার বালা দু'টো বাঁধা রেখে এলাম। শেষ রাতে খোকারও যায় যায় অবস্থা—অক্সিজেন দিতে হল।' একটু চুপ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে শ্রীনিবাস আস্তে আস্তে সিধা হইয়া গেল, 'আচ্ছা, আমাদের সব একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে কেন বল্‌তো ? একমাস আগে পরে চাকরী গেল, একসঙ্গে অসুখ বিসুখ সুরু হল, কাল রাত্রে এক সময়ে এদিকে সন্তুর মা ওদিকে খোকা—'

দুর্ভাগ্যের এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দুই বন্ধুকে নির্বাক করিয়া রাখে। বন্ধু তারা অনেকদিনের, সব মানুষের মধ্যে দু'জনে তারা সব চেয়ে কাছাকাছি। আজ হঠাৎ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর নিকটতর মনে হইতে থাকে। দু'জনেই আশ্চর্য হইয়া যায়।

'টাকা পেলি না ?'

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িল।

'গোটা দশেক টাকা রাখ। নিখিলবাবুকে একবার আনিস।'

পকেট হইতে পুরাণো একটা চামড়ার মনিব্যাগ বাহির করিয়া কতকগুলি ভাঁজ করা নোট হইতে একটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিল। কিছু আবেগ ও কিছু অনির্দ্দিষ্ট উত্তেজনায় সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে। তার স্ত্রীর বালা বিক্রীর টাকা, মরণাপন্ন ছেলের চিকিৎসার টাকা। আবেগ ও উত্তেজনায় একটু কাবু হইয়া ঝোঁকের মাথায় না দিলে একেবারে দশটা টাকা বন্ধুকে সে দিতেই বা পারিবে কেন!

‘গেলাম ভাই। বসবার সময় নেই। একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাব।’

একটু অতিরিক্ত ব্যস্তভাবেই সে চলিয়া গেল। নিজের উদারতায় লজ্জা পাইয়া বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দু’মিনিটের মধ্যে আরও বেশী ব্যস্তভাবে সে ফিরিয়া আসিল। আতঙ্কে ধরা গলায় বলিল, ‘ব্যাগটা ফেলে গেছি।’

‘এখানে ? পকেটে রাখলি যে ?’

‘পকেটে রাখবার সময় বোধ হয় পড়ে গেছে।’

তাই যদি হয়, তক্তপোষে পড়িয়া থাকার কথা। ঘনশ্যামকে টাকা দিয়া পকেটে ব্যাগ রাখিবার সময় শ্রীনিবাস বসিয়া ছিল। ঘর এত বেশী অন্ধকার নয় যে, চামড়ার একটা মনিব্যাগ চোখে পড়িবে না। তবে তক্তপোষের নীচে বেশ অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া তক্তপোষের নীচে আয়নায় প্রতিফলিত আলো ফেলিয়া খোঁজা হইল। মেঝেতে চোখ বুলাইয়া কতবার যে শ্রীনিবাস সমস্ত ঘরে পাক খাইয়া বেড়াইল। ঘনশ্যামের সঙ্গে তিনবার পথে নামিয়া দু’টি বাড়ির পরে পান বিড়ির দোকানের সামনে পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল! তারপর তক্তপোষে বসিয়া পড়িয়া মরার মত বলিল,

'কোথায় পড়ল তবে ? এইটুকু মোটে গেছি, বিড়ির দোকান পর্যন্ত। এক পয়সার বিড়ি কিনব বলে পকেটে হাত দিয়েই দেখি ব্যাগ নেই।'

ঘনশ্যাম আরও বেশী মরার মত বলিল 'রাস্তায় পড়েছে মনে হয়। পড়ামাত্র হয়তো কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে রাস্তায় পড়ল, একজন কুড়িয়ে নিল ! পকেট থেকে পড়বেই বা কেন তাই ভাবছি।'

'যখন যায়, এমনিভাবেই যায়। শনির দৃষ্টি লাগলে পোড়া শোল মাছ পালাতে পারে।'

'তাই দেখছি। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা যাবে।'

ঘনশ্যামের মুখের চামড়ায় টান পড়িয়া সির সির করিতে থাকে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটা পকেটে ভরিবার পর এমনি হইয়াছিল। এখনও ব্যাগটা ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অসাবধান বন্ধুর সঙ্গে এটুকু তামসা করা চলে, তাতে দোষ হয় না। তবে দশটা টাকা দিলেও ডাক্তার নিয়া গিয়া ও ছেলেকে দেখাইতে পারিবে। দশ টাকায় মণিমালার যদি চিকিৎসা হয়, ওর ছেলের হইবে না কেন !

শ্রীনিবাস নীরবে নোটটি ফিরিয়া নিল। পকেটে রাখিল না, মুঠা করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। সমান বিপন্ন বন্ধুকে খানিক আগে যাচিয়া যে টাকা দিয়াছিল সেটা ফিরাইয়া নেওয়ার সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার হয়তো করিতেছে। নিরুপায় দুঃখে, ব্যাগ হারানোর দুঃখ নয়, এই দশ টাকা ফেরত নিতে হওয়ার দুঃখে, হয়তো ওর কান্না আসিবার উপক্রম হইয়াছে। ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। ঘনশ্যাম মমতা বোধ করে। ভাবে, মিছামিছি ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

'গোটা পঁচিশেক টাকা যোগাড় করতে পারব শ্রীনিবাস।'

'পারবি? বাঁচা গেল। আমি তাই ভাবছিলাম। সত্বর মার চিকিৎসা না করলেও তো চলবে না।'

শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরণ বহিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মত জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোন কারণে গা ঘেসিয়া আসিত, কোন রকমে যদি পেটের কাছে তার কোন অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত! তাড়াতাড়িতে সার্টের নীচে কোঁচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশী গুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাইতেও তার সাহস হইতেছিল না, বেশী উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চোখে পড়ে। অশ্বিনীর সোণার ঘড়ি আলগাভাবে সার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তো একবারও হয় নাই। সেখানেই ভয় ছিল বেশী। তার ব্যাগ লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাসা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনরকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ওরকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বসিত। ভাবিলে এখন তার আতঙ্ক হয়। সেখানে কি নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল! ঘড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল পাতলা সার্টের পকেটা। তখন সে খেয়ালও করে নাই। অশ্বিনী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, তোমার পকেটে কি ঘনশ্যাম!

ঘরের স্যাঁতসেঁতে শৈত্যে ঘনশ্যামের অন্য সব দুশ্চিন্তা টানকরা

চামড়ার ভিজিয়া ওঠার মত শিথিল হইয়া যায়, উত্তেজনা ঝিমাইয়া পড়ে, মনের মধ্যে কষ্টবোধের মত চাপ দিয়া থাকে শুধু এক দুর্ব্বহ উদ্বেগ। অশ্বিনীর মনে খটকা লাগিবে। অশ্বিনী সন্দেহ করিবে। পশুপতি তাকে অশ্বিনীর বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছে। পশুপতি যদি ওকথা তাকে বলে, বলিবে নিশ্চয়, অশ্বিনীর কি মনে হইবে না ঘড়িটা ঘনশ্যাম নিলেও নিতে পারে ?

এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে অবিরত পাক খাইতে থাকে। শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির করে ঘনশ্যামের। সন্দেহ যদি অশ্বিনীর হয়, ভাসা ভাসা ভিত্তিহীন কাল্পনিক সন্দেহ, তার তাতে কি আসিয়া যায়, ঘনশ্যাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করে নাই, কোন সন্দেহও তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কি এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে ? শেষ রাত্রে মণিমালার নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়াছে, এক তাড়া দশ টাকার নোটের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঁচ টাকার একটি নোট ছুঁড়িয়া দিয়াছে। আর দিয়াছে একখানা কাপড় কাচা সাবান। চাকরকে দিয়া আনাইয়া দিয়াছে। সন্দেহ ছোট কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিয়া জানিলেই বা তার ক্ষতি কি ?

বাড়ির সামনে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দে সে চমকিয়া ওঠে। নিশ্চয় অশ্বিনী আসিয়াছে। পুলিশ নয়তো ? অশ্বিনীকে বিশ্বাস নাই। ঘড়ি হারাইয়াছে টের পাওয়া মাত্র পশুপতির কাছে খবর শুনিয়া সে হয়তো একেবারে পুলিশ লইয়া বাড়ী সার্চ করিতে আসিয়াছে। অশ্বিনী সব পারে।

না, অশ্বিনী নয়। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখিতে আসিয়াছে।

কিন্তু ঘড়িটা এভাবে কাছে রাখা উচিত নয়। বাড়ীতে রাখাও উচিত নয়। ডাক্তার বিদায় হইলেই সে ঘড়িটা বেচিয়া দিয়া আসিবে। যেখানে হোক, যত দামে হোক। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে পরীক্ষা করে, অর্ধেক মন দিয়া ঘনশ্যাম তার প্রশ্নের জবাব দেয়। সোণার ঘড়ি কোথায় বিক্রী করা সহজ ও নিরাপদ তাই সে ভাবিতে থাকে সমস্তক্ষণ। বাহিরের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণের সঙ্কেতময় নীরবতার পর নিখিল ডাক্তার গম্ভীর চিন্তিত মুখে যা বলে তার মানে সে প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মণিমালা বাঁচিবে না? কেন বাঁচিবে না? এখন তো তার টাকার অভাব নাই, যতবার খুসী ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবে। মণিমালার না বাঁচিবার কি কারণ থাকিতে পারে!

'ভাল করে দেখেছেন?'

বোকার মত প্রশ্ন করা। মাথার মধ্যে সব যেরকম গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাতে বোকা না বনিয়াই বা সে কি করে। গোড়ায় ডাক্তার ডাকিলে, সময়মত দু'চারটা ইনজেকশন পড়িলে মণিমালা বাঁচিত। তিন-চার দিন আগে ব্রেন কম্‌প্লিকেশন আরম্ভ হওয়ায় প্রথম দিকে চিকিৎসা আরম্ভ হইলেও বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। তিন চার দিন! মণিমালা যে ক্রমাগত মাথাটা এপাশ ওপাশ করিত, চোখ কপালে তুলিয়া রাখিত, সেটা তবে ব্রেন খারাপ হওয়ার লক্ষণ। রুলি খুলিতে গেলে সে সজ্ঞানে বাধা দেয় নাই, হাতে টান লাগায় আপনা হইতে মুখ বিকৃত করিয়া গলায় বিশ্রী ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ করিয়াছিল। স্থির নিশ্চল না হইয়াও মানুষের জ্ঞান যে লোপ পাইতে পারে অত কি ঘনশ্যাম জানিত।

চেষ্টা প্রাণপণে করিতে হইবে। তবে এখন সব ভগবানের হাতে।

ডাক্তারও ভগবানের দোহাই দেয়। এতদিন সব ডাক্তারের হাতে ছিল, এখন ভগবানের হাতে চলিয়া গিয়াছে। নিখিল ডাক্তার চলিয়া গেলে বাহিরের ঘরে বসিয়াই ঘনশ্যাম চিন্তাগুলি গুছাইবার চেষ্টা করে। কালও মণিমালার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিল, ডাক্তারের এ কথায় তার কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। শেষ রাত্রে নাড়ী ছাড়িয়া একরকম মরিয়া গিয়াও মণিমালা তবে বাঁচিয়া উঠিল কেন? তখন তো শেষ হইয়া যাইতে পারিত। মণিমালার মরণ নিশ্চিত হইয়াছে আজ সকালে। ডাক্তার বুঝিতে পারে নাই, এখনকার অবস্থা দেখিয়া আন্দাজে ভুল অনুমান করিয়াছে। ঘনশ্যাম যখন অশ্বিনীর ঘড়িটা চুরি করিয়াছিল, তার জীবনে প্রথম চুরি, তখন মণিমালা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ওর চিকিৎসার জন্য সে পাপ করিয়াছে কিনা, ওর চিকিৎসা তাই হইয়া গিয়াছে নিরর্থক। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার আগে নিখিল ডাক্তারকে আনিয়া সে যদি মণিমালাকে দেখাইত, নিখিল ডাক্তার নিশ্চয় অন্য কথা বলিত।

ঘড়িটা ফিরাইয়া দিবে?

খুব সহজেই তা পারা যায়। এখনো হয়তো জানাজানিও হয় নাই। কোন এক ছুতায় অশ্বিনীর বাড়ি গিয়া এক ফাঁকে টেবিলের উপর ঘড়িটা রাখিয়া দিলেই হইল।

আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে এই যে তার পীড়ন চলিতেছে আতঙ্ক ও উদ্বেগের, তার হাত হইতে সে তো মুক্তি পাইবে। যাই সে ভাবুক, অশ্বিনী যে তাকে মনে মনে সন্দেহ করিবে সে তা সহ্য করিতে পারিবে না। এই কয়েক ঘণ্টা সে কি সহজ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! পশুপতি যখন তাকে অশ্বিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল, তাকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা যখন আছে

অশ্বিনীর, ঘড়িটা রাখিয়া আসাই ভাল। এমনিই অশ্বিনী তাকে যে রকম অবজ্ঞা করে গরীব বলিয়া, অপদার্থ বলিয়া, তার উপর চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে না জানি কি ঘৃণাটাই সে তাকে করিবে! কাজ নাই তার তুচ্ছ একটা সোণার ঘড়িতে।

টাকাও তার আছে। পঁচিশ টাকা।

ভিতরে গিয়া মণিমালাকে একবার দেখিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর আগাইয়া সে শ্রীনিবাসের মণিব্যাগটা বাহির করিল। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়াই চলিতে চলিতে এক সময় আলগোছে ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল। খানিকটা গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাতি হাতে পাঞ্জাবী গায়ে একজন মাঝবয়সী গোঁপওয়ালা লোক খালি ব্যাগটার উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া কতই যেন আনমনে অন্যদিকে চাহিয়া আছে।

ঘনশ্যাম একটু হাসিল। একটু পরেই ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া লোকটি সরিয়া পড়িবে। হয়তো কোন পার্কে নির্জন বেঞ্চে বসিয়া পরম আগ্রহে সে ব্যাগটা খুলিবে। যখন দেখিবে ভিতরটা একেবারে খালি, কি মজাই হইবে তখন! খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা পর্যন্ত সে ব্যাগটা হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে।

স্টপেজে ট্রাম থামাইয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা থাকায় সুবিধা হইয়াছে। নয়তো ট্রামের টিকিট কেনা যাইত না। তার কাছে শুধু দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট।

অশ্বিনীর বৈঠকখানায় লোক ছিল না। তার নিজের বসিবার ঘরটিও খালি! টেবিলে কয়েকটা চিঠির উপর ঘড়িটা চাপা দেওয়া ছিল, চিঠিগুলি

এখনো তেমনিভাবে পড়িয়া আছে। ঘড়িটি চিঠিগুলির উপর রাখিয়া ঘনশ্যাম বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

বেল টিপিতে আসিল পশুপতি।—'বাবু যে আবার এলেন?'

'বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

ভিতরে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুপতি ফিরিয়া আসিল।

'বিকেলে আসতে বললেন ঘনোস্‌শ্যামবাবু, চারটের সময়।'

ঘনশ্যাম কাতর হইয়া বলিল, 'আমার এখুনি দেখা করা দরকার, তুমি আরেকবার বলো গিয়ে পশুপতি। বোলো যে ডাক্তার সেনের কাছে একটা চিঠির জন্য এসেছি।'

তারপর অশ্বিনী ঘনশ্যামকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইল, অর্ধেক ফি'তে মণিমালাকে একবার দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তার বন্ধু ডাক্তার সেনের নামে একখানা চিঠিও লিখিয়া দিল। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এইসব লীলাখেলা অশ্বিনী ভালবাসে, নিজেকে তার গৌরবান্বিত মনে হয়।

চিঠিখানা ঘনশ্যামের হাতে দেওয়ার আগে সে কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ফি'র টাকা বাকী রাখলে চলবে না কিন্তু। আমি অপদস্থ হব। টাকা আছে তো?'

ঘনশ্যাম বলিল, 'আছে। ওনার গয়না বেচে দিলাম, কি করি।'

ট্র্যাজেডির পর

একদিন সকালের ডাকে সত্যপ্রসাদ একখানা চিঠি পাইলেন। কলিকাতা হইতে একজন আত্মীয় চিঠিখানা লিখিয়াছে। বেলা এগারটার গাড়িতে সত্যপ্রসাদ কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রি এগারটার সময় হাজির হইলেন সহরের বিশেষ অঞ্চলে একটি দোতালা বাড়ীর সামনে। আত্মীয়টিকে তিনি সঙ্গে আনেন নাই। মিহিরের যে বন্ধুটি সঙ্গে আসিয়াছিল তাকে ট্যাক্সিতে বসাইয়া রাখিয়া একা দোতালায় উঠিয়া গেলেন। একটি স্ত্রীলোক বারান্দায় রেলিং ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যপ্রসাদ দক্ষিণ-পশ্চিমের কোণের ঘরখানার খোলা দরজা দিয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সোরগোল বন্ধ হইয়া গেল। মিহিরের বন্ধু তিনজন জিজ্ঞাসু এবং মেয়েটি ভীত চোখে চাহিয়া রহিল। মিহির সবে মেয়েটির মুখের কাছে গ্লাস তুলিয়া ধরিয়াছিল। মেয়েটির মুখখানা আশ্চর্য রকম কচি আর বিষণ্ণ। বোধ হয় সেইজন্তই মিহির তাকে পছন্দ করিয়াছে।

হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া মেয়েটির কম দামী বেশী রঙীন শাড়ীটি ভিজিয়া গেল। মিহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাবা!'

সত্যপ্রসাদ দুহাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'আয় বাবা আয়। বুকে আয় আমার।'

বাপের এই নাটকীয় আবির্ভাব ও নাটকীয় আহ্বান মিহিরের সহ্য হইল না। পাশ কাটাইয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সত্যপ্রসাদ কিন্তু তাকে বুকে না নিয়া ছাড়িলেন না। ট্যাক্সির এককোণে সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া ছিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাশে বসিয়া হু'হাতে তাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন, 'তাতে কি হয়েছে বাবা, তাতে কি হয়েছে। একবার হু'বার ভুল করলে কি হয়? এ বয়সে সবাই ভুল করে। আমিও করেছি।'

সত্যপ্রসাদ মদের স্বাদ কেমন জানেন না। পণ্যা নারীর ঘরের ভিতরের দৃশ্য জীবনে আজ প্রথম দেখিলেন। পরদিন ছেলেকে সঙ্গে করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ছেলের চেহারা দেখিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, চার মাস আগে কি ছেলে কলিকাতায় গিয়াছিল, অসুখ বিসুখ কিছু হয় নাই তবু কি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

তারপর দিন কাটিতে লাগিল। মিহিরের সম্বন্ধে সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল। এ ছেলের কাছে আর কিছু আশা করা যায় না। শুধু এইটুকু ভরসা যে অলস অকর্মণ্য খেয়ালী উদাস জীবনটা সে যাপন করিতেছে। বাড়িতে। অন্যভাবে গোল্লায় যাওয়ার ঝোঁকটা কাটিয়া গিয়াছে।

সংসারের সঙ্গে মিহিরের যেন কোন যোগ নাই, এতলোকের মধ্যে সে একা হইয়া গিয়াছে। কারও সঙ্গ তার ভাল লাগে না। স্নেহমমতা, আদরযত্ন কিছুই চায় না। নিজের ঘরে শুইয়া বসিয়া সে সময় কাটায়, অসময়ে বাহির হইয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, চার মাইল দূরে ভাসাই নদীর ধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোথাও কোন অবস্থাতেই আর বাহিরের জগতের সঙ্গে সে সম্পর্ক যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অল্পদিন আগেও যা বজায় ছিল।

অর্ধ অন্যমনস্কতার আড়ালে চুপি চুপি দৃশ্য আর শব্দের অসংখ্য উপচারে জগত তার মনের সমস্ত ফাঁক ভরিয়া রাখিত, আজ তাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছে। নিজের ঘরের নির্জনতায়, বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, বাড়ির বাহিরে মানুষের জীবনস্রোতে, প্রান্তর ও নদীতীরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেখানেই সে থাক, ভিতরের শূন্যতা শুধু তাকে পীড়ন করে। ঘুম আসিতে মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়, ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হয় অনেক। বাড়ীর পিছনের প্রকাণ্ড দীঘিতে শামুকের খোঁজে গভীর জলে তলাইয়া গেলে যেমন খুব ভারি একটা স্তব্ধতা দম আটকাইয়া দিতেছে মনে হইত, তেমনি একটা চাপের মতই চেতনা যেন এক মুহূর্তে চারিদিক হইতে তাকে চাপিয়া ধরে। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস টানিতে হয়। সেই সময় কয়েক মুহূর্তের জন্য দুঃখ যেন দেহের কষ্টে পরিণত হয়। ঘুম ভাঙ্গিবার কথা ভাবিয়া ঘুমানোর আগে তার ভয় করে।

তারপর ভোঁতা, অবসন্ন, বিষাদময় জাগরণের জের টানিয়া চলা। গ্রীষ্মের দিনে গুমোটের গরমে মেসের ঘরে নোংরা চাদরে শুইয়া ঘামে ভিজিতে ভিজিতে ঝিমানোর মত জীবনকে কদর্য মনে করিয়া হয়তো সকালটা কাটিয়া গেল। কলেজ কামাই করা দুপুরের শেষে একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যর্থ সম্ভাবনার জ্বালাভরা ক্ষুব্ধ বৈরাগ্যের ঝাঁঝ হয়তো শুধু পরিবেশন করিয়া গেল সারা দুপুরটি। অথবা হয়তো এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা, ঘুমন্ত সহরের একটি মেসের ছাতে বিছানো মাদুরে শুইয়া জ্যোৎস্না আর তারাভরা আকাশে নিজেকে ছড়াইয়া দিবার নির্বোধ অবাধ্য কামনার অতি শান্ত, অতি রহস্যময়, অতি অসহ্য ব্যাকুলতা সকাল হইতে মনকে দখল করিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর কিন্তু প্রতিদিন সব বদলাইয়া যায়। তখন তীব্রতায় মৃদু ও ব্যাপ্তিতে বিপুল এক বেদনাবোধ মন জুড়িয়া থমথম করিতে থাকে। মনে হয় যেন নেশা হইয়াছে। একজনকে ভুলিবার জন্য বন্ধু যে দুরন্ত নেশার সন্ধান দিয়াছিল সে নেশা নয়। ঘুমের ওষুধ খাইয়া জাগিয়া থাকিবার নেশা, স্বপ্ন দেখার নেশা!

বাস্তবের প্রথম বড় আঘাত আসিল উপেক্ষায়।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। স্নান করিয়াও নিজেকে মনে হইতেছে জ্বরছাড়া রুগীর মত। বারান্দায় বাড়ির সকলে জড়ো হইয়া মহোৎসাহে কি যেন আলোচনা করিতেছে। তার কথা? কেন সকলে তার কথা আলোচনা করে;

ধীরে ধীরে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। মিহির যে এখনো কিছু খায় নাই সকালে উঠিয়া সে কথা কি মার খেয়াল নাই? মাসীর? দিদির? মিহিরের মন অসন্তোষে ভরিয়া যায়।

তার ভগ্নী বাসন্তীর বিবাহের কথা আলোচনা হইতেছে। পাত্র ঠিক হইয়া গিয়াছে, দেনাপাওনা ঠিক হইয়া গিয়াছে, আগামী মাসের মাঝামাঝি বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। ছেলের বাবা হঠাৎ একটা অতিরিক্ত দাবী জানাইয়াছেন, খুব সামান্য দাবী। সেই তুচ্ছ বিষয়ে মহাসমারোহে কথা কাটাকাটি চলিতেছে।

মিহিরের যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। বাসন্তীর বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে সে কিছু জানে না। দিনের পর দিন সকলে এমনিভাবে পরামর্শ করিয়াছে, তাকে ডাকা হয় নাই, খবর দেওয়া হয় নাই!

তারপর মিহিরের মনে হয়, তাকে কিছু না জানানো হয়তো

এদের ইচ্ছাকৃত নয়। বাড়ীতে এতবড় একটা ব্যাপার চলিতেছে, বাড়ীতে যে আছে সে কিছু টের পাইবে না, তাকে ডাকিয়া জানাইয়া দিতে হইবে, একথা কেউ কল্পনাও করে নাই। সকলে ভাবিয়াছে, সে জানিয়াও উদাসীন হইয়া আছে, সংসারের দৈনন্দিন ছোট ছোট বিষয়ের মত এই বড় বিষয়টি নিয়াও সে এক মুহূর্তের জন্য মাথা ঘামাইতে চায় না। বাড়ির সকলকে সে কি এতদিন সত্যই এমনভাবে অবহেলা করিয়াছে? মিহির একটু লজ্জা বোধ করিতে থাকে। উবু হইয়া বসিয়া সে বলে, 'সামান্য পঞ্চাশ ষাট টাকার ব্যাপার তো, ও নিয়ে আর গোলমাল করে কাজ নাই।'

কেবল মাসী একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকায় আর সংক্ষেপে বলে, 'কেবল টাকার জন্য নয়।' আর কিছু বলার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না। আর কেউ তার দিকে তাকায় না।

পিসীর ছেলে সুধীর কুড়ি টাকায় এখানকার কাপড়ের মিলে এপ্রেণ্টিসের কাজ আরম্ভ করিয়াছে, মিহিরের চেয়ে সে তিন বছরের ছোট। সে গম্ভীর মুখে বলিতে আরম্ভ করে, 'আমি বলি কি—'

সকলে মন দিয়া তার কথা শোনে।

মিহির চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এইসব অতিপরিচিত মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসী-পিসীদের হঠাৎ তার এক ভিন্ন জগতের মানুষ মনে হয়। সে যেন কোনদিন এদের দলে ছিল না, এদের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই। কোন মিল নাই। এতকাল খেয়াল ছিল না, ক'মাস নিজেকে নিয়া থাকিয়া আজ প্রথম এদের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে গিয়াই টের পাইয়াছে। এদের অনুভূতি অন্য সুরে বাঁধা, সুখ-দুঃখের রূপ অন্যরকম। যে দুঃখ তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে সে দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতাও এদের নাই। এরা হিসাবী, সংযত, ধৈর্যশীল, এদের

অনুভূতি কখনো একটা নির্দিষ্ট সীমা পার হইতে পারে না, জীবনের যে পরিধির মধ্যে এদের সম্পূর্ণতা তার আঘাত এদের শুধু কাঁদাইতে পারে, এমন আঘাত নাই এদের যা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে।

সাত বছরের মিনি পর্যন্ত যেন এই বর্ম আঁটিয়াছে, তার কচি মুখের ভঙ্গি দেখলে তাই মনে হয়।

মিহিরের গৌরব বোধ করার কথা, গ্লানি বোধের বিরক্তিতে তার রাগের মত জ্বালা হয়।

'খেতে দেবে না আমাকে ?'

'ওই তো রান্নাঘরে ঢাকা আছে, খা গিয়ে।'

'চা বানাবে না ?'

'বাবারে বাবা, দুটো কথা কইতে দিবি নে ? স্তসপেনে চা তৈরী আছে, গরম করে দিলেই হবে।'

মিহির গটগট করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যায়। পথে দীনু পাগলা চলিতেছে। অকারণ হাসি আর অর্থহীন কথা তার পাগলামী। আঁচড়ানো চুল, কামানো দাড়ি আর পরিষ্কার জামা-কাপড় দেখিয়া তাকে পাগল মনে হয় না। আগে চাকরী করিত, সংসার করিত, বৌ তাকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়ায় পাগল হইয়া গিয়াছে। বৌ-এর জন্য পাগল হয়, সাধারণ ভাবে বিয়ে করা বৌ-এর জন্য ? মিহির কোনদিন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। দীনু পাগলা নিজেও অস্বীকার করে। সে বলে, বিয়ে করলাম কবে ? বৌ কোথা পাব ? ওই যে চাঁদ দেখছ না আকাশে, একদিন চাঁদ থেকে একটা টুকরো খসে পড়েছিল আমার উঠোনে। চাঁদ ব্যাটা কেপ্পন, সাঁ করে নেমে এসে টুকরোটা নিয়ে পালিয়ে গেল। কি ঝাঁঝ চাঁদের। দূর থেকে জোছনা মিঠে লাগে, চাঁদ একবারটি ঘরের উঠোনে এলে টের পেতে।

চোখ দুটো ঝল্‌সে গেছল, সেই থেকে জ্বালা করে। বড্ড জ্বালা করে দাদা চোখ দুটো আমার।

'ষাট, ষাট।' চরণ ঘোষ বাঁশের চোঙ্গায় আঙ্গুল ডুবাইয়া চট করিয়া দীনু পাগলার দু চোখে সরিষার তেল লাগাইয়া দেয়। চোখের তেল আর জল মুছিতে মুছিতে দীনু হাসে।

পাগল! যে অসাধারণ কিছু বলে আর করে সেই তো পাগল? মিহির ভাবিতে ভাবিতে আগাইয়া যায়। কে যেন উপদেশ দিয়া তাকে একদিন বলিয়াছিল, এসব পাগলামি ছাড়ো। আরও কে একজন যেন কার কাছে মন্তব্য করিয়াছিল, কেমন পাগলাটে হয়ে গেছে ছেলেটা।

পাড়ার শেষে ললিতাদের বাড়ী। আগে, একবার বাড়ী আসার আগে, যখন তখন সে এবাড়ীতে আসিত। আজ বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। চায়ের জন্য অস্বস্তি বোধ হইতেছে। ললিতার মা তাকে আদর করিয়া খাবার আর চা খাওয়াইবেন। বাড়ী আসিয়া চাহিয়া খাইলে ললিতার মা বড় খুসী হন। একেবারে যেন কৃতার্থ হইয়া যান।

কেবল, ললিতাকে তার ঘাড়ে চাপানোর একটা আশা তিনি পোষণ করেন, এই যা একটু অসুবিধা। তা, এ আশা তার মনে আছে, থাক্। কোন ললিতার স্থান তো তার জীবনে আর নাই, কার মনে কি আছে, সে কথা ভাবিবার তার প্রয়োজন কি?

কিন্তু কই, ললিতার মার অভ্যর্থনায় তো তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। এতকাল পরে সে আসিয়াছে, তাকে দেখিয়াই আনন্দে বিগলিত হওয়ার বদলে শুধু বলিলেন, 'কে, মিহির?' যেমন বড়ি দিতেছিলেন তেমনি বড়ি দিতে লাগিলেন, বসিতে আসন দিলেন না, মুখেও বলিলেন না, এসো। ললিতা শুধু একটু জড়সড় হইয়া গেল। একবার চোখ

তুলিয়া দেখিয়া চোখের সঙ্গে মাথাটাও অনেকখানি নামাইয়া ফেলিল।

'আসি আসি' করে আসা হয়নি, মাসীমা।'

'তাতে কি হয়েছে। বোসো। মোড়াটা এনে দে ললিতা।'

ললিতা মোড়াটা আনিয়া দেয়।

'আলোচালটা বেছে ফেলবি যা তো ললিতা।'

কিছুই অস্পষ্ট নয়। প্রতি মিনিটে আরও স্পষ্ট হইতে থাকে। আগে আগ্রহের সঙ্গে তাকে ঘরের ছেলের মত প্রশ্রয় দেওয়ার মর্মও যেমন সহজেই বোঝা গিয়াছিল, আজ তার সঙ্গে সঙ্কুচিত ভদ্রতার মর্ম বুঝিতেও তেমনি কষ্ট হয় না। ললিতার মার ভয় হইয়াছে, সে পাছে এখনও ঘরের ছেলের মত হইয়া থাকাব জের টানিয়া চলিতে জিদ করে। ললিতার মা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কতটুকু ভদ্রতা করিলে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

ললিতাও কি একটু ভয় পাইয়াছিল? কিভাবে যেন তার দিকে তাকাইয়াছিল ললিতা, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে, সে একটা কথাও বলে নাই। আগে সে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ললিতা মুখর হইয়া উঠিত, আজ একেবারে মূক হইয়া থাকিয়াছে।

দিগম্বরের ময়রার দোকানে মিহির কিছু খাবার খাইয়া পেট ভরাইল। এখানে চা-ও পাওয়া যায়। এই খাবার আর চায়ের দাম দিবার পয়সা তার নাই। ধারে সে এখানে যত খুসী খাইতে পারে, সেটুকু মর্যাদা তার এখনো আছে। একদিন দাম মিটাইয়া দিতে হইবে। বাপের কাছে তখন পয়সা চাহিতে হইবে মিহিরের। বাপের কাছে পয়সা চাহিবার কথা ভাবিয়া, জীবনে আজ এই প্রথম, মিহিরের লজ্জা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিতেই স্নান করিয়া খাওয়ার তাগিদ আসিল। তার জন্ম কেউ হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। এখনো সকলের খাওয়ার হাঙ্গামা চুকিতে অনেক দেরী, এখন হইতে তাগিদ কেন, ভৎর্সনা কেন? সে তো বলিয়াই রাখিয়াছে তার জন্ম বসিয়া থাকিবার দরকার নাই, ভাত বাড়িয়া রাখিবে। নিজের খুসীমত সময়ে সে ভাত খাইবে, তা-ও কি কারও সহ্য হয় না? তা ছাড়া, এমনভাবে বলে কেন! আগের মত কাছে আসিয়া গায়ে হাতবুলানো তোষামোদের মত দাবী আর ভৎর্সনা জানায় না কেন?

সুধীর কাজে চলিয়া গিয়াছে। সত্যপ্রসাদ কাজে যাওয়ার জন্ম ঢোলা কোট-পেণ্টালুন পরিয়া প্রস্তুত হইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকায় টান দিতেছেন। পিসীমা রোদে দেওয়া তোষকটি উল্টাইয়া দিতেছেন। দিদি ভাত মাখিয়া ছোট ছেলেটির মুখে তুলিয়া দিতেছে। বাসন্তী গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে এঘর ওঘর করিতেছে।

ঘামে ভেজা জামাটা খুলিতে খুলিতে মিহির কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করিতে লাগিল। সে তো সকলকে ত্যাগ করে নাই, ধীরে ধীরে তাকেই সকলে ত্যাগ করিতেছে। তার কাছে প্রত্যাশা যত কমিতেছে, তার মূল্যও তত কমিয়া যাইতেছে। প্রথম সকলে কাঁদিয়াছিল, এখনো হয়তো শুধু কথা উঠিলে একটু আপশোষ করে, দুদিন পরে তাও করিবে না।

রাত্রে বারান্দায় সকলে সারি দিয়া খাইতে বসিলে অনেকদিন পরে মিহির একসঙ্গে বসিয়া খাইতে আসিল। কেউ যে বিশেষ আশ্চর্য হইল তা নয়, মিহির নিজের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সকলে ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলে, মিহিরের মনে হয় তার অনভ্যস্ত উপস্থিতির জন্ম সকলের বোধ হয় কেমন কেমন লাগিতেছে।

সে যে কাছে বসিয়া খায় না, এত অল্প সময়ের মধ্যেই এটা সকলের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ?

পাঁচ টাকা বেতন বাড়িবার সুসংবাদ বহিয়া আনিয়া সুধীরের মাথাটা যেন আজ গর্বেই উঁচু হইয়া আছে। সত্যপ্রসাদ তাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, 'পার্মানেণ্ট হতে কত দেরী আছে তোর ?'

সুধীর অহঙ্কারের বাড়তি বিনয়ের সঙ্গে জানায়, 'সামনের মার্চ মাসে একটা এগজামিন হবে, তারপর দশ টাকা বাড়িয়ে পার্মানেণ্ট করে দেবে।'

সামনের মার্চের এখনো ন'মাস বাকী! সুধীরের ভাব দেখিয়া মনে হয়, আজ রাত্রে ঘুমাইয়া কাল ভোরে উঠিলে যেন দেখা যাইবে, মার্চ মাস সুরু হইয়া গিয়াছে। এই বয়সে এত ধৈর্য সে কোথায় পাইল কে জানে!

মা বলিলেন, 'তুইও এমনি একটা কোথাও ঢুকে পড় না মিহির ?'

পিসেমশায় বলিলেন, 'হ্যাঁ, একটা কিছু করতে হবে বৈকি। বসে থাকলে চলবে কেন ?'

দিদি সুধীরের দিকে চোখ রাখিয়া বলিল, 'বসে থেকে দিন দিন স্বভাব আরও বিগড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণের জানালাটা তুই বন্ধ করে রাখিস তো মিহির। ওদিকে পুকুরঘাট, মেয়েরা চান করে, কি দরকার তোর ওদিকের জানালা খুলে রাখবার ?'

ঘরে গিয়া মিহির দেখিল, সিগারেটের প্যাকেটে একটিও সিগারেট নাই। বালিশের পাশে একটা আধখানা সিগারেট নিভাইয়া রাখিয়াছিল মনে পড়ায় মিহির সেটি খুঁজিতে বালিশটা উল্টাইয়া দিল। আশ্চর্য হইয়া দেখিল, বালিশের নীচে চাদরটা ধবধবে পরিষ্কার। চাদরের বাকী সমস্তটা এমন ময়লা হইয়া গিয়াছে ? কতদিন আগে বালিশের

ওয়াড় খুলিয়া ফেলিয়াছিল, আজও কেউ নতুন ওয়াড় পরাইয়া দেয় নাই ?

মিহির একটু জল খাইতে গেল। কুঁজোটা খালি পড়িয়া আছে।

মালী

ভুবন পিয়নের ছেলে মনোহর ছেলেবেলা হইতে ফুলের বাগান ভালবাসিতে শিখিল। মালিকের ভাসা ভাসা ভালবাসা নয়, মালীর মাটী খুঁড়িয়া শিকড়-কামড়ানো প্রেম।

ভুবন পিয়নের বাড়ীর কাছেই একজন রায়বাহাদুরের মস্ত বাগান, ফুল আর লতাপাতার গন্ধ ও রূপে ঠাসা। পনের বছর বয়সেই বাগানের মালীর কাজে সাহায্য করিয়া মনোহর মাসে ছ'টাকা করিয়া উপার্জন করিতে লাগিল। টাকাটা না পাইলে ভুবন তাকে এ কাজে লাগিতে দিত কিনা সন্দেহ।

বাইশ বছর বয়সে স্থানীয় কালেক্টরের বাংলো-ঘেরা বাগানে সহকারী মালীর পদটা মনোহরের জুটিয়া গেল। বেতন যে তার অনেক বাড়িয়া গেল তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া কালেক্টরের স্ত্রী মিসেস লাইয়ন নতুন ছোকরা মালীকে এত বেশী পছন্দ করিয়া ফেলিল যে, তাড়াতাড়ি বেতন বৃদ্ধি আর পদোন্নতির সম্ভাবনায়ও কারও সন্দেহ রহিল না।

সেই সঙ্গে বাড়িল সম্মান—এবং গর্ব। উর্দি আঁটিয়া যে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায় তার ছেলেকে সঙ্গে করিয়া প্রায়ই বাগানে হাঁটিতে দেখা যায় সেই নারীকে যে শুধু মেমসায়েব নয়, সহরে যার স্থান আর সমস্ত নারীর উর্ধে—একি সহজ সম্মান ও গর্বের কথা!

সহরের লাল ধুলিভরা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে উর্দির নীচে ভুবনের শরীর ঘামে ভিজিয়া ওঠে, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যায়, কিন্তু মনে তার

উত্তেজনার সীমা থাকে না। পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছে সুযোগ পাইলেই সে বলিয়া বেড়ায় মিসেস লাইয়ন তার ছেলেকে কত ভালবাসে। মাঝে মাঝে প্রমাণও দাখিল করে।

'পশু´ সকালে জ্বর হয়েছিল বলে কাজে যায়নি তো, বললে না পেত্যয় যাবে দাদা, একটু বেলা হতেই মেমসায়েব নিজে খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়ে দেছে। সে এক কাণ্ড আর কি!...

ভুবনের বৌ রোজই প্রায় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি বললো রে মেমসায়েব?'

মনোহর সাগ্রহে, সগর্বে বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া যায়। কেবল মা'র কাছে নয়, যে শোনে তারই কাছে। ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এবং বানাইয়াও এত কিছু বলে যে সব কথা কাণে গেলে লাইয়ন সাহেবের হয় তো সন্দেহই জাগিয়া যাইত, বিশ বাইশ বছর আগে কোর্টিং-এর সময় যেমন করিত এতদিন পরে মিসস লাইয়ন বুঝি সহকারী মালীটার সঙ্গে আবার তারই পুনরভিনয় আরম্ভ করিয়াছে।

আসলে মিসেস লাইয়ন হয়তো বাগানে আসিয়া ডাকে, 'মালী-ই-ই... !'

প্রধান মালী বৃন্দাবন সামনে গিয়া বলে, 'হুজুর!'

মিসেস লাইয়ন একটা ফুলগাছ দেখাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে, ফুল ফোটে নাই কেন? বৃন্দাবন বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে যে বছরের এক এক সময়ে এক একটা গাছে ফুল ফোটে, সব সময় ফোটে না।

'বজ্জাত! উল্লু! তুম কুছু জানতা নাই।

মনোহর কাছেই থাকে, তখন ডাক পড়ে তার। মেমসায়েব যা বলে তাই সে স্বীকার করিয়া নেয়, কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা করে না। বেশী করিয়া জল আর সার দিলে ফুল ফুটিবে না? নিশ্চয় ফুটিবে

যে সারের নামও কোন দিন শোনে নাই, আজই সে সার আনিয়া গাছের গোড়ায় দিবে।

তিন চারটা কুঁকড়ানো কুঁড়ি পাতার আড়ালে লুকাইয়া আছে মনোহর আগেই দেখিয়াছিল, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আরো গোটা দুই আবিষ্কার করা যায়। তিন দিন পরে মিসেস লাইয়নকে সে শীর্ণ ফুল কয়েকটি এবং দু'টি নতুন কুঁড়ি দেখাইয়া দেয়। মিসেস লাইয়নের অবশ্য কোন কথাই মনে ছিল না, কোন দিন থাকেও না। সেই গাছটিতে ফুল ফোটে না কেন তাই নিয়া কোন দিনই হয়তো আর সে গোলমাল করিত না। মনোহর মনে পড়াইয়া দেওয়ায় তার উৎসাহ আর অধ্যবসায় দেখিয়া খুসী হইয়া তাকে একটা টাকাই বখশীশ দিয়া ফেলে।

খানিক তফাতে বেড়ার পাতা ছাঁটা বন্ধ করিয়া বৃন্দাবন হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল প্রথম হইতেই, হাঁ বন্ধ হইয়া তার দাঁত কড়মড় করিতে থাকে।

নতুন চকচকে টাকা। মনোহর একবার হাতের তালুতে টাকার দিকে, একবার চকচকে পোষাক পরা মিসেস লাইয়নের দিকে, একবার চকচকে বাগানের দিকে তাকায়। এখানে চারিদিকেই চাকচিক্য। কি বিচিত্র রঙ ফুলে আর পাতাবাহারের পাতায়! মিসেস লাইয়নের গালে আর ঠোঁঠে পর্যন্ত রঙ। জগতে যে এত রং আর রূপ আছে এখানে কাজ করিতে আসিবার আগে মনোহর তা কল্পনাও করিতে পারিত না।

সাজানোই বা কি নিখুঁত, একটি যেন ছবি আঁকা হইয়া আছে, বাতাসের দোলনেও চিরন্তন সামঞ্জস্যের পরিবর্তন ঘটে না। একটি চারা স্থানভ্রষ্ট নয়, একটি শীষ বিপথগামী নয়, খাপছাড়া একটি ফুল ফোটে না, পাতা গজায় না। লনের চারিদিকে সবুজ লাইন এমন

কৌশলে ছাঁটা যে দেখিলে মনে হয় নিবিড় ঘাসে ঢাকা লনটাই যেন সীমানায় পৌঁছিয়া ঢেউয়ের মত উথলাইয়া উঠিয়াছে।

মিসেস লাইয়নকেই ব এ বাগানে কি চমৎকার মানায়। এক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির মত ফুলে ছাওয়া ছোট একটি চারকোণা প্লটের ধারে মিসেস লাইয়নকে মনে হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা জীবন্ত ফুল। ভাগ্যে এখানে কাজটা সে পাইয়াছিল! এরকম বাগান মনোহরের স্বর্গেও বোধ হয় নাই। রায়বাহাদুরের বাগান শুধু ফুলের চারায় ঠাসা—যেখানে সেখানে যেভাবে খুশী রোপণ করা হইয়াছে, নিয়ম নাই, হিসাব নাই, বাছাবাছি নাই। মানুষ সেখানে কাজ করিতে পারে?

তবু মুগ্ধ ও উত্তেজিত মনোহরের মনটা খুঁত খুত করিতে থাকে। সব আছে কিন্তু কি যেন এখানে নাই। কি যেন থাকা উচিত ছিল, কিসের একটা অভাবের জন্য সে যেন এখানে ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে। খাইয়া পেট না ভরার মত মৃদু একটা অস্বস্তি মনোহরকে পীড়ন করিতে থাকে। অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে সে বাগানে কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। মিসেস লাইয়ন চলিয়া যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে বাগানের দক্ষিণ সীমানায় এক ঝাঁক আজালি চারার কাছে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টানিয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া থাকে। একপাশে কয়েকটি অনাদৃত রজনীগন্ধা ফুটিয়াছে।

এখানে রজনীগন্ধা ফুটিতে দেওয়া উচিত হয় নাই, বাগানের শৃঙ্খলা নষ্ট করা হইয়াছে। এটা তার নিজেরই কীর্তি, কয়েক দিন আগে নিজেই সে খেয়ালের বশে এ ফুল ফুটিবার সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছিল।

তুলিয়া ফেলিবে ?

ভ্রু কুঁচকাইয়া মনোহর এই গুরুতর প্রশ্নের জবাব খুঁজিতেছে, বৃন্দাবন আসিয়া তার দাবী জানায়, 'মতে ভাগ দিস !'

বৃন্দাবন সুপিরিয়র অফিসার, বখশীশে ভাগ বসাইবার অধিকার তার আছে। মনোহরের কাছে খুচরা পয়সা ছিল না, বৃন্দাবনের কাছে ভাঙ্গানি থাকিলেও চকচকে টাকাটি ভাঙ্গাইতে মনোহর কিছুতেই রাজী হয় না। বৃন্দাবন তাকে গালি দিতে আরম্ভ করে—সঙ্গে সঙ্গে বখশীশের ভাগ না পাওয়ার জন্যই কেবল নয়।

সেদিন বাড়ীতে মনোহর বিবরণ দেয়ঃ মেমসায়েব কি বললো জানো, বললো, আমার মত কাজ কেউ জানে না। রোদে কাজ করে করে ঘেমে গেছি দেখে নিজে আমায় ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরবৎ খেতে দিল। কি মিষ্টি সরবৎ। কি গন্ধ সরবতে !

বখশীশের কথাটা মনোহর উল্লেখ করে না। ভুবন জানিতে পারিলে টাকাটা কাড়িয়া নিবে।

ভুবন শত্রু ও মিত্রের কাছে বিবরণ দেয়ঃ কি চোখেই যে ছেলেটাকে দেখেছে মেমসায়েব। বললে না পেত্যয় যাবে, আজকে ঘরে নিয়ে কাছে বসিয়ে খাইয়েছে। ফল মিষ্টি আর সরবৎ খাইয়েছে, অন্য কিছু নয়।...

ভোরে মনোহর কাজে যায়, দুপুরবেলা ভাত খাইতে বাড়ী আসে। আবার বিকালে কাজে গিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। সব মাটির শরীর একদিন মাটিতে মিশিয়া যায় সত্য কিন্তু আপাততঃ মাটি ঘাঁটিয়া মনোহরের দেহে অপূর্ব শ্রী দেখা দিতে থাকে। রায়বাহাদুরের বাগানে কাজ আরম্ভ করার আগে সে ছিল শুষ্ক শীর্ণ আর নোংরা, কয়েক বছরে তার এমন পরিবর্তন হইয়াছে যেন তার

দেহের বাগানে তারই মত একজন উৎসাহী মালী কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রায়বাহাদুরের বাগানে কাজ করার সময়েও সে ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর খাকী হাফ শার্ট পরিত, এখন সে সর্বদাই রীতিমত বাবু সাজিয়া থাকে। মিসেস লাইয়ন চাকর বাকরের অপরিচ্ছন্নতা দু'চোখে দেখিতে পারে না।

কাজে যাওয়ার জন্য মনোহর ছটফট করিতে থাকে, বাড়ীতে তার ভাল লাগে না। বাগানের বাহিরে আসিলেই তার ভিতরের মৃদু অভাববোধ উবিয়া যায়, শুধু থাকে বাগানের আকর্ষণ। গেটের বাহিরে পা দিয়াই সে ভাবিতে আরম্ভ করে, কতক্ষণে আবার ফিরিয়া আসিবে।

মাস ছয়েক সে একরকম পৃথিবীই ভুলিয়া থাকে, কোন দিকে মন দেওয়ার অবসর পায় না। গোবরার তাসের আড্ডায় যদি বা যায় শুধু গল্প করে মিসেস লাইয়ন আর তার বাগানের। এত যে সে ভালবাসিত রায়বাহাদুরের বাগান, দু'ঘণ্টার কাজের জন্য নাম মাত্র বেতন পাইয়া সারাদিন সেখানে পড়িয়া থাকিত, ছ'মাসের মধ্যে একবার সে বাগানে উঁকি দেওয়ার সুযোগও তার হয় না।

হেমন্তের এক অপরাহ্নে মনোহরকে একবার রায়বাহাদুরের বাড়ী যাইতে হইল। পরিষ্কার সাজ পোষাক বজায় রাখা তার একটা মস্ত সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সহকারী ছোকরা মালী আর কত বেতন পায়, মাঝে মাঝে চকচকে একটা টাকা বকশিশ পাইলেই বা কত জামা কাপড় কেনা যায়! রায়বাহাদুরের ছেলে অনেক, জামা কাপড় তাদের অফুরন্ত, ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য হওয়ার অনেক আগেই জামা কাপড় তারা ত্যাগ করে। আগে অনেকবার মনোহর অনেক

জামা কাপড় বকশিশ পাইয়াছে, সকলে তাকে যেরকম স্নেহ করিত এখন গিয়া চাহিলে কি আর কয়েকটা পাওয়া যাইবে না ?

বাগানের সামনে চুণবালি খসা ইট বাহির করা পুরানো প্রাচীর। মিসেস লাইয়নের বাগানের বহিঃপ্রাচীর দেখিতে অভ্যস্ত চোখে এ প্রাচীর দেখিয়াই মনোহরের মনে অবজ্ঞা জাগা উচিত ছিল। কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া পড়িল, ক্লোরোফর্মের ঝাপটা লাগিয়া চেতনা যেন তার অবশ হইয়া আসিয়াছে। বাতাস বহিতেছে অতি মৃদু, ভাল করিয়া অনুভবও করা যায় না, কিন্তু নানা ফুলের যে মিশ্রিত গাঢ় গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে তা যেন স্পর্শ করা যায়।

মরিচা ধরা লোহার গেট ঠেলিয়া মনোহর ভিতরে গেল, গেট খুলিতে আর বন্ধ করিতে যে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠিল সেটা তার কাণে গেল কিনা সন্দেহ। বাগানের মধ্যে ফুলের গন্ধ আরও বেশী ঘন, আরও বেশী মোহকর। দম যেন আটকাইয়া আসিতে চায়। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া আছে, সাধারণ চেনা সুগন্ধি ফুল। কয়েক মাসের অযত্ন আর অবহেলার চিহ্ন চারিদিকে স্পষ্ট চোখে পড়ে, গোড়ায় জল দেওয়া আর ঝরাপাতা জমিলে ঝাঁটাইয়া ফেলা ছাড়া বাগানের দিকে এতকাল কেউ বিশেষ নজর দিয়াছে কিনা সন্দেহ। চারিদিকে কত যে আগাছা মাথা উঁচু করিয়াছে ! গাছগুলির কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা জমকালো, কোনটা শীর্ণ,—ডালপাতা সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। কিন্তু তাতে ফুল ফুটিবার বাধা হয় নাই।

মনোহর বাগানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রায়বাহাদুরের গিন্নী তিন মেয়ে, এক বৌ আর দুই ভাগ্নীকে সঙ্গে নিয়া পাড়ায়

বেড়াইতে যাওয়ার জন্ত বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে গুটী সাতেক ছোটবড় ছেলে মেয়ে। মনোহরকে দেখিয়া বৌটি ছাড়া সকলেই সমস্বরে বলিল, 'কেরে, মনোহর!'

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে।'

বৌটি ছাড়া সকলের পরনেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের একরঙা শাড়ী, বৌটির শাড়ী রামধনু রঙের। ছেলেমেয়েদের ফ্রকগুলির রঙও কম বিচিত্র নয়। গন্ধের নেশায় আত্মহারা মনোহরের মধ্যে এতক্ষণে মৃদু একটা অসন্তোষের ভাব দুর করিবার জন্তই নানা আকারের এতগুলি জীবন্ত রঙীন ফুল যেন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'না বলে কয়ে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলি যে বড়?'

মনোহর আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আপনারা রাখলেন না তো কি করি।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'রাখলাম না! কবে আবার রাখলাম না তোকে, নেমকহারাম বজ্জাৎ?' রায়বাহাদুরের মোটাসোটা গিন্নী হাসিমুখে গালাগালি দিয়াই চাকরবাকরের সঙ্গে কথা বলে।

বড় মেয়ে বলিল, 'তুই নাকি লাইয়ন সাহেবের বাড়ীতে কাজ করিস?'

মেজ মেয়ে বলিল, 'ভাল কয়েকটা বিলাতী ফুলের চারা এনে দে' না আমাদের? দিবি?'

ছোট মেয়ে বলিল, 'আমাদের কাজ তো ছেড়ে দিলি, সায়েব যখন দু'দিন পরে বদলী হয়ে যাবে, তখন তুই করবি কিরে মনোহর?'

বৌটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'সায়েব বুঝি বাংলো সঙ্গে নিয়ে যাবে ঠাকুরঝি?'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তুমি চুপ কর বৌমা, সব কথায় তোমার কথা কওয়া কেন ? তুই ক'টাকা মাইনে পাস্ রে মনোহর ?'

মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে, পনের টাকা !'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'ও বাবা ! সাত আট টাকা মাইনে দিলে কত গণ্ডা গণ্ডা মালী পাওয়া যায়—পনের টাকা !'

বৌটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'খেতে পরতে তো দেয় না।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'আঃ, তুমি চুপ কর না বৌমা !—তুই কি চাস্ ?'

মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে এমনি দেখা করতে এসেছি।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তা বেশ করেছিস। তা স্থাখ্, সাত টাকায় যদি থাকিস তো তোকে রাখতে পারি। এক বেলা খাওয়া পাবি ! থাকবি ?

মনোহর চিন্তা করিল না, কারণ চিন্তা করিবার ক্ষমতা তার ছিল না। প্রত্যেকটি নিশ্বাসে গন্ধের প্রতীক হইয়া তার অতীত জীবন তার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তার সমস্ত মানসিক শক্তি আত্মসমর্পণ করিয়াছে এই একটিমাত্র গন্ধরূপী মোহের প্রভাবে। চোখ বুজিয়া মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে, থাকব।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'আচ্ছা, কাল থেকে আসিস তা হ'লে। বিলাতি ফুলগাছ আনিস কিন্তু—যটা পারিস।'

বৌটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'কাল কাজ ছেড়ে এলে তো এমাসের মাইনে পাবে না।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'বৌমা ! চুপ কর। কাল সকাল থেকে আসবি তো ?'

মনোহর বলিল, 'আসব।'

আচ্ছন্নের মত মিসেস লায়ইনের বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে মনোহর ভাবিতে থাকে, আজই মেমসাহেবের কাছে বিদায় নিতে হইবে! এ বাগানে কাজ করিবার এতটুকু আগ্রহও আর মনোহরের নাই। রায়বাহাদুরের বাগানে যাওয়ায় জন্য তার মনটা ছটফট করিতেছে। এ বাগানে মানুষ কাজ করে! বাগানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিলে আর টের পাওয়া যায় না যে এখানে বাগান আছে। নিজের মনে এখানে কিছু করিবার উপায় নাই, কলের মত শুধু খাটিয়া যাওয়া। এ যেন জেলখানার বাগানে জেলের কয়েদীর কাজ করা। রায়বাহাদুরের বাগানে সে যা খুসী করিতে পারিবে। কেউ প্রশ্ন করিবে না, বাধা দিবে না, দিন দিন বাগানের উন্নতি দেখিয়া শুধু খুসী হইবে। প্রতিদিন বাছিয়া বাছিয়া সে ফুল তুলিয়া দিবে, রায়বাহাদুরের বৌ আর মেয়েরা সেই ফুলে গাঁথিবে মালা! ছবির মত করিয়াই সে এবার রায়বাহাদুরের বাগানটি সাজাইবে—শুধু সুগন্ধি ফুলের গাছে। আরও রাশি রাশি ফুল ফুটাইবে। কাছে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতে হইবে না, অনেক দূর হইতেই লোকে টের পাইয়া যাইবে, কাছাকাছি ফুলের বাগান আছে।

'কাল থেকে কাজে আসব না, বৃন্দাবন।'

বৃন্দাবন বিশ্বাস করিল না—'হুঁঃ।'

মিসেস লাইয়ন আর আসেই না। শেষ বেলায় সোনালী রোদ বাগানে আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের তেজ কমিয়া আসার সঙ্গে বাগানের রঙ যেন আরও উজ্জ্বল, আরও বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিতে থাকে। বোকার মত দাঁড়াইয়া মনোহর মাথা নাড়ে, নিজের মনে বলে, না, এত রঙ ভাল নয়।

সূর্যাস্তের পর বাগানে নামিয়া আসিয়া মিসেস লাইয়ন ডাকিল, 'মালী-ই-ই…'

মনোহর কাছে আগাইয়া গেল। বুকের মধ্যে তার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে! কি করিয়া বলিবে, সে আর কাজে আসিবে না! মিসেস লাইয়ন যদি রাগ করে, যদি গালাগালি দিতে আরম্ভ করে? যদি তাকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়।

মনোহরের আগেই বৃন্দাবন কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মিসেস লাইয়ন বলিল, 'বজ্জাত! উল্লু! বোলাতা শুন্‌তা নেই? টেবিলমে বড়া বড়া লাল গোলাপ দেও—গন্ধবালা।'

বৃন্দাবন বলিল, 'হুজুর।'

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মনোহর মিসেস লাইয়নের আরও কাছে আগাইয়া গেল। এত কাছে যাওয়ার সাহস তার আগে কোনদিন হয় নাই।

'হুজুর—'

করুণ সুরে বিদায়বাণী আরম্ভ করিতে গিয়া মনোহর থামিয়া গেল। কিসের গন্ধ নাকে লাগিতেছে? এমন মৃদু এমন মধুর এমন এই-আছে এই-নাই খাপছাড়া আশ্চর্য গন্ধ? কোন ফুলের এরকম গন্ধ আছে বলিয়া তো তার জানা নাই। নানা ফুলের মিশ্রিত গন্ধও এরকম হয় না। এতকাল সে ফুল ঘাঁটিতেছে, ফুলের গন্ধই এরকম হয় না।

বুক ভরিয়া মনোহর বাতাস গ্রহণ করে, কিন্তু জোরে শ্বাস টানিতে গিয়া গন্ধ পায় না। এরকম জোর-জবরদস্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিবার মত গন্ধ এটা নয়। সাধারণভাবে মৃদু মৃদু শ্বাস গ্রহণের মধ্যেই এ গন্ধ নিজেকে ধরা দেয়।

মিসেস লাইয়ন বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কিয়া মাংতা?'

মনোহর বলিল, 'হুজুর, বাগানমে গন্ধবালা ফুল বড় কমতি আছে।'

মিসেস লাইয়ন বলিল, 'কাহে কমতি আছে? গন্ধবালা ফুল লাগাতা নাই কাহে?'

মিসেস লাইয়নের দিকে আরও একটু ঝুঁকিয়া অদ্ভুত মাদকতাভরা অচেনা মিহি সুবাস আরও একটু স্পষ্টভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়া মনোহর সাগ্রহে বলিল, 'আলবৎ লাগায়গা হুজুর।

মিসেস লাইয়ন বলিল, 'আলবৎ লাগায়গা। বজ্জাৎ! উল্লু!'

ফিরিবার সময় মিসেস লাইয়নের বাগান হইতে মনোহর কয়েকটা চারা চুরি করিয়া নিয়া গেল। কাজ করিবে না শুনিয়া রায়বাহাদুরের গিন্নী চটিয়া যাইবে। চারাগুলি পাইলে একটু খুসী হইতে পারে। তাছাড়া নিজের জন্য কিছু পুরানো জামাকাপড় আর মিসেস লাইয়নের জন্য রায়বাহাদুরের বাগানের কয়েকটা চারাও তাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কোন বাড়ীর মেয়েরা বেড়াইতে আসিয়াছিল, ঘেরা বারান্দায় মাদুর আর পাটি পাতিয়া রায়বাহাদুরের গিন্নী সকলকে বসাইয়াছে, বাড়ীর বৌ আর মেয়েরাও সকলে উপস্থিত আছে। ভিতরে ঢুকিবার আগেই মনোহর একটা অজানা জোরালো গন্ধ অনুভব করিতেছিল, সঙ্কুচিত পদে এক পা ভিতরে দিয়াই তীব্র গন্ধে সে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাগান পার হইয়া সে ভিতরে আসিয়াছে, বাগানের গন্ধের সঙ্গে এখানকার গন্ধের কোন মিল নাই। ফুলের গন্ধ এরকম হয় না।

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'গট গট করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলি যে বড়? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

বৌটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'ওতো বাড়ীর মধ্যে ঢোকেই।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তুমি চুপ কর বৌমা। শোন্ বলি

মনোহর, তোকে আমরা রাখতে পারব না বাপু! কর্তা বারণ করে দিয়েছে। আমরা তোকে ভাঙ্গিয়ে এনেছি জেনে কালেক্টর সায়েব শেষে চটে যাক আর কি!'

মনোহর ভাবিতেছিল, মিসেস লাইয়নের কাছে বিদায় না নিয়াও কাজ ছাড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে, কাল সকাল হইতে এখানে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেই হইবে। বিদায় নিয়া আসিলেও ক'দিনের মাহিনা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। কিছু না বলিয়া হঠাৎ কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে মিসেস লাইয়নের মনে কত কষ্ট হইবে ভাবিয়া মনোহরের মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। রায়বাহাদুরের গিন্নীর মন্তব্য শুনিয়া সে যন্ত্রের মত বলিল, 'আজ্ঞে।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তোকে যে ফুলগাছ আনতে বলেছিলাম, এনেছিস?'

মনোহর এবারও শুধু বলিল, 'আজ্ঞে।'

সাধু

আজ অপরাহ্নে নগেনবাবুর গুরুদেবের প্রতিনিধি হিসাবে তার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ বিষ্ণুপদানন্দ আসিবেন। নগেনবাবুর ছোট ছেলে ভূপালের বিবাহ হইয়াছে বছরখানেক আগে, কিন্তু বৌটিকে এখনও মন্ত্রপূত করিয়া লওয়া হয় নাই। কাল সব নিয়মিত অনুষ্ঠানের পর শ্রীমৎ কৃষ্ণপদানন্দ নতুন বৌ-এর কানে মন্ত্র দিবেন।

গুরুদেব স্বয়ং আসিয়া মন্ত্র দিতে পারিলেন না বলিয়া সকলের মনেই ক্ষোভ জাগিয়াছে। কিন্তু বুড়োবয়সে তাঁর শরীর অসুস্থ, এতদূর আসিয়া পরম ভক্ত নগেনবাবুর ছোট ছেলের বৌ-এর কানে মন্ত্র দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নাই। একজনের মনে শুধু ক্ষোভ নাই এ বিষয়ে। সে নগেনবাবুর বড় ছেলে গোপালের বৌ সুমতি। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বুড়ো গুরুদেব নিজে তার কানে মন্ত্র দিলেন, তাদের আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, ধর্মে মতি হোক। অতবড় সাধকের আশীর্বাদ কি ব্যর্থ যায়! একমাসের মধ্যে স্বামী তার সন্ন্যাসী হইয়া গেল। তাকে শুধু বলিয়া গেল, সংসারে তার মন নাই, বিবাহ করিয়া সে মস্ত ভুল করিয়াছে।

আরও একটি কথা সে বলিয়াছিল, 'তুমিও যাবে সুমতি ?'

সুমতি বলিয়াছিল, 'তুমি পাগল হয়েছ ?'

তারপর দশবছর কাটিয়া গিয়াছে গোপালের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চার মাসে ভাল করিয়া যার সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত হয় নাই, তার জন্ত মনোবেদনা সুমতি বিশেষ কিছু বোধ করে নাই। পরে ধীরে ধীরে জীবনের অসংখ্য ব্যর্থতার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে স্বামীর

অভাব, স্বামীহীন সধবা-জীবনের অসঙ্গতি, অপমান ও দুর্গতি। স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে নাই বলিয়া তখন তার আপশোষের সীমা থাকে নাই, স্বামীকে চাহিয়া উদ্দাম কামনা তাহার হৃদয়মনে মাথা কুটিয়া মরিয়াছে। আজও সে মাঝে মাঝে কল্পনা করে গোপাল হয়তো ফিরিয়া আসিবে। ছেলেমানুষ বৌ তার যে আহ্বানের কোন অর্থই বুঝিতে পারে নাই, একটিবার ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই আহ্বান তাকে সে জানাইবে।

বুড়ো গুরুদেবের আশীর্বাদের ফল তাব জীবনে এভাবে ফলিয়াছে দেখিয়া ছোটবৌ-এর বেলা তাঁর শিষ্যের আগমন তাই সুমতিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। বুড়োর ভয়ঙ্কর আশীর্বাদে কাজ নাই ছোট বৌ-এর।

কৃষ্ণপদানন্দের চেহারা দেখিয়া পাড়াশুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গেরুয়া লুঙ্গি পরা, গেরুয়া পাঞ্জাবী গায়ে, খড়ম পায়ে দিয়া এ যেন রাজা বা দেবতার আবির্ভাব—ছদ্মবেশী গোপালের আগমন। গোপালেরও এরকম দীর্ঘ বলিষ্ঠ অপূর্ব্ব চেহারা ছিল।

কিন্তু না, এ গোপাল নয়। দেখিলে গোপালকে মনে করাইয়া দেয়, কিন্তু গোপালের সঙ্গে এর কোন মিল নাই। সে কথা ভাবাই মিছে।

সুমতি তাকে প্রণাম করিল সকলের শেষে। কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সে কৃষ্ণপদানন্দকে দেখিতেছিল এবং কৃষ্ণপদানন্দ বার বার তার দিকে তাকাইতেই সর্বাঙ্গে তার শিহরণ বহিয়া যাইতে ছিল। না, এ গোপাল নয়। সুমতি অন্য সকলের মত গোপালের সঙ্গে অমিল খোঁজার বদলে খুঁজিতেছিল মিল। না, গোপালের সঙ্গে সাধুর মিল নাই। প্রণাম করার সময় একটা অনিবার্য্য প্রমাণও সে

আবিষ্কার করিল। সাধুর পায়ের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি তেরচা নয়।

তবু, গোপাল না হওয়া সত্ত্বেও, এই গেরুয়া পরা মানুষটি মাঝখানের দশ এগার বছরের ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিয়া যেন তার কয়েক মাসের স্বামী-সোহাগের দিনগুলির জের টানিতে আসিয়াছে। সুমতির হৃদয় ধড়াস্ ধড়াস্ করে। ঘোমটা দিয়া তার কনে বৌ সাজিতে ইচ্ছা হয়। দশ এগার বছরের স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে হাস্যকর হইলেও বিশেষভাবে সাজসজ্জা করে নাই কেন ভাবিয়া বড় আপশোষ জাগে।

গোপালের মা তখন কাতর কণ্ঠে কৃষ্ণপদানন্দের কাছে আপশোষ করিতেছেন : 'ও বড় হতভাগিনী বাবা। ওকে বৌ করে আনলুম, কদিন পরে ছেলে আমার সন্নেসী হয়ে গেল। শুধু দুটি কথা লিখে রেখে গেল, বৌকে যেন আদর যত্নে রাখি, বৌ-এর দোষ নেই। তা আদর যত্নে বৌকে রেখেছি বাবা, ওর দিকে তাকাতে ভয় করে, তুমিই চেয়ে ছাখো। কিন্তু বৌমার দোষ ছিল না তাতো ভাবতে পারি না বাবা! এমন সুন্দরী দেখে বৌ আনলাম তোকে, ছেলেটাকে আমার তুই যদি ঘরে আটকে না রাখতে পারলি—'

নগেন গভীর অভিমানের সুরে বলিলেন, 'চুপ কর। সব শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছে!'

কৃষ্ণপদানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁর কথা বলে দিয়েছেন। তাঁর কিছু অজানা নেই। বলেছেন, কৃষ্ণপদানন্দ! নগেনের ঘরে একটি মেয়ে শ্রীরাধিকার সাধনা করছেন, এ জগতে অতবড় সাধিকা আর নেই। শ্রীকৃষ্ণ অথবা স্বামী কার জন্য এ সাধনা, ঠিক বুঝতে পারছে না মেয়েটি। তুমি ওকে বলে বুঝিয়ে দিয়ে

এসো।' কাল ছোট বৌমাকে মন্ত্র দেব। তারপর ওকে সাধনার পথ দেখিয়ে দেব।"

গভীর রাত্রে সুমতি কৃষ্ণপদানন্দের শয্যায় আসিয়া বসিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অর্ধেক ফুলে ঢাকা প্রকাণ্ড একটি ছবি বেদীর উপর রাখা হইয়াছে। এই ঘরে পূজার্চনা হয়, মাঝে মাঝে কীর্তনাদির বড় অনুষ্ঠানও হয়। মেঝেতে কার্পেট ও কম্বলের শয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান শিষ্যকে শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এঘরে আর কারও শয়নের অধিকার নেই। সুমতি আরেক বার তার বুড়ো আঙ্গুলটি পরীক্ষা করিতে যাওয়ায় কৃষ্ণপদানন্দ উঠিয়া বসিল।

'তুমি আমায় চিনতে পেরেছ সুমতি ?'

'পায়ের তেরচা আঙ্গুল কি হ'ল ?'

'সর্বদা খড়ম পরায় সোজা হয়ে গেছে।'

'মুখ চোখ বদলে গেছে কেন ?'

'দশ বছর সাধনা করছি। সে কি সাধনা তুমি জান না। মানুষের চেহারা আগাগোড়া বদলে যায়।

সুমতি তার পায়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, 'তুমি মিছে কথা বলছ।'

'মিছে কথা আমি বলিনি সুমতি।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির বেদীতে বড় বড় প্রদীপের একটি নিভিয়া গিয়াছে, একটি দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। স্থির আলোয় একসঙ্গে বেশীক্ষণ কেউ কারো মুখ দেখিতে পাইতেছে না। কৃষ্ণপদানন্দ আবার বলিল, 'প্রথমে একটি মিছে কথা বলেছিলাম। দীক্ষা নেওয়ার সময় বলেছিলাম আমি ব্রহ্মচারী, জীবনে স্ত্রীলোক স্পর্শ করিনি। আজও

এই মিথ্যা আমার সমস্ত সাধনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে সুমতি! তাই তোমাকে নিতে এসেছি।'

'আমি যদি তোমার স্ত্রী, সকলকে জানিয়ে আমায় নিয়ে যাচ্ছ না কেন ? একটা কলঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইছ কেন তোমার নিজের নামে আর আমার নামে ?'

কৃষ্ণপদানন্দ প্রদীপের বুকে জ্বলা সলতেটি নিভাইয়া দিল। অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'আমার সন্ন্যাস জীবনের আগেকার কোন জীবন নেই। আমার কোন কলঙ্ক নেই। তোমাকেও সংসারে কি হবে লোকে কি বলবে, এসব ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে সুমতি।'

এবার একটু আগাইয়া সুমতি তার বুকে মাথা রাখিল। স্বামীর কাছে আশ্রয় খোঁজার মত দুহাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তুমি আমার স্বামী নও।'

'আমি তোমার স্বামী সুমতি। মোটে দশটা বছর কেটে গেছে, নিজের স্বামীকে তুমি চিনতে পারছ না ?'

'মা বাবা কেন পারলেন না ? আমি দু'দিন তোমায় দেখছি, মা তো জন্ম থেকে তোমায় মানুষ করেছেন ? আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেছি।'

'কি বুঝতে পেরেছ ?'

সুমতি কৃষ্ণপদানন্দের এক মাথা চুল মুঠি করিয়া ধরিয়াছে, এত আস্তে সে কথা বলিতেছে যে এত কাছে থাকিয়াও কৃষ্ণপদানন্দের শুনিতে কষ্ট হইতেছে।

'পূজোর সময় আমরা যখন আশ্রমে গিয়েছিলাম, তুমি সর্বদা আমায় চেয়ে চেয়ে দেখতে। অত শিষ্যের মধ্যে আমাদের থাকবার ভাল ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে। আজ তুমি আমায় নিতে এসেছো।

আমার স্বামী সেজে আমায় নিতে এসেছে। তোমার কি ভয় ছিল আমি এমনি তোমার সঙ্গে যাব না? তাই স্বামী সেজে এসেছো? চল না কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে। তুমি অতবড় সাধু, এতদিন দেখে আমার ভুলতে পারোনি—এতদিন পরে আমায় নিতে এসেছো। তুমি ডাকলেই আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাব। চলো আমায় নিয়ে—স্বামীর চেয়ে বড়ো করে তোমায় দেখবো, স্বামীর চেয়ে তোমায় বেশী ভালবাসব।'

কৃষ্ণপদানন্দ হতাশার সুরে বলিল, 'কিন্তু আমি যে সত্যই তোমার স্বামী সুমতি।'

সুমতি ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া বলিল, 'কেন ভয় করছ? কেন ভাবছ, স্বামী নও বলে তোমাকে কম ভালবাসব? স্বামীকে আমি ভুলে গেছি। তোমাকেই আমি ভালবাসি।'

অন্ধকারেও বোঝা গেল এবার কৃষ্ণপদানন্দের গলার সুর হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

'তাই' ঠিক সুমতি। দশ এগার বছর স্বামীকে চোখেও দেখনি, তাকে ভুলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তবু বেছে বেছে আমাকেই ভালবেসে ফেললে কেন?'

'তা জানি না। তোমাকে দেখেই আমার কেমন যেন—'সুমতি চুপ করিয়া গেল। অনুভব করিল, কৃষ্ণপদানন্দ যেন অন্ধকারে হাসিতেছে। বেদীর বহু প্রদীপের একটি জ্বালিয়া সে দেখিতে পাইল, সত্যই কৃষ্ণপদানন্দের মুখে একটা দুর্বোধ্য ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া আছে। ক্ষণিকের জন্য সুমতির মনে হইল, এ যেন তার চেনা হাসি, একদিন বিদায়কামী কার মুখে যেন এই হাসি দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

'আচ্ছা, ঘুমোতে যাও সুমতি।'

'যাবে না ?'

'যাব বৈকি, কাল ভোরে যাব।'

'ভোরে ? ভোরে দশজনের সামনে আমি কি করে যাব ?'

'তুমি তো যাবে না। আমি যাব।'

সুমতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ভাঙ্গা গলায় বলিল, 'আচ্ছা তোমাকে স্বামী বলেই মেনে নিলাম। আমারি হয়তো ভুল হয়েছে।'

কৃষ্ণপদানন্দ শান্ত তীব্রতার সঙ্গে বলিল, 'মেনে নিলে হয় না সুমতি, বিশ্বাস করতে হয়। ভুল হলে চলে না, ভুল আগে ভাঙ্গতে হয়।'

তিন দিন কৃষ্ণপদানন্দ এখানে থাকিবেন কথা ছিল, পরদিন সকালেই তিনি যাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, কি অপরাধে ঠাকুর তাহাদের ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ?

কৃষ্ণপদানন্দ বলিল, 'অপরাধ কারো নেই। আমার গৃহত্যাগের ডাক এসেছে।'

গোপালের মা কাঁদিয়া বলিল, 'ও হতভাগীর কোন উপায় করে গেলে না বাবা ?'

কৃষ্ণপদানন্দ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'ওর উপায় করে দিয়েছি, মা। স্বামীকে ভুলিয়ে দিয়েছি।'

একটি খোয়া

যতই ঘটা করা যাক্, সহরে যেন জমে না, কারো চমক লাগে না। সহরে ধনীর সংখ্যাধিক্য রায় বাহাদুরকে পীড়ন করে। মেয়ের বিবাহ দিতে তাই দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে, দশটা গ্রামে সাড়া পড়িয়াছে, কত যে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি সমাজে সেটা বুঝা যাইতেছে স্পষ্ট। মানুষের ঈর্ষা ভয় শ্রদ্ধা ভক্তি তোষামোদে রায়বাহাদুরের আমিত্ব ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বেলুন হইলে ফাটিয়া যাইত।

বিবাহের দিন বিকালে মিহির আসিল। বাড়ীর মানুষের ভিড়ে জহরকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেল।

'জহরকে দেখছি না রায়বাহাদুর-কাকা?'

'জহর? ওকে বলিনি বাবা।' রায় বাহাদুরের উজ্জ্বল মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে।—'ভরসা পাইনি বলতে। বাড়ীর অন্য সবাইকে বলেছি, দূর হোক নিকট হোক সম্পর্ক যখন একটা আছে না ডেকে তো পার নেই। কিন্তু বলে দিয়েছি জহর যেন না আসে। নিখিল বাবু আসবেন, মিষ্টার দাস আসবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসবেন—' ছোট ছেলের মুখের লজেঞ্জসের মত কথাগুলি রায় বাহাদুর জিভ দিয়া ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া উচ্চারণ করেন, 'এসে যদি জহরকে দেখেন এ বাড়ীতে, কি বিপদ হবে বল দিকি? কবে কলকতায় দু'বছর আমার বাড়ী থেকে ছোঁড়া কলেজে পড়েছিল, তা পর্যন্ত ওঁরা জানেন। নেমন্তন্ন করতে গিয়েছি, কি বললে জান সেদিন

আমায় ? তোমার নিজের লোক, ছেলেটাকে শাসন করতে পারনি রায় বাহাদুর ? আমি শ্রেফ জবাব দিলাম,—আমার কাছে যদ্দিন ছিল ভালই ছিল সার, কুসঙ্গে মিশে পরে বিগড়ে গেছে। তারপর থেকে বাড়ীতে ঢুকতে দিই না সার। আমার হয়েছে জ্বালা। কোন মাথা পাগল ছেলে কোথায় স্বদেশী করবে, একটা সম্পর্ক আছে বলে দায়ী হব আমি। অমন সম্পর্ক তো আছে দশ বিশ গণ্ডা ছেলের সঙ্গে, সবাইকে সামলে চলতে হবে নাকি আমায় ?'

শুধু মিহিরকে জহরের অনুপস্থিতির কারণটা বুঝাইয়া দিবার জন্য এত ব্যাখ্যা যেন নয়, রায় বাহাদুর যেন নিজেকেও বুঝাইতেছেন। আরও অনেকবার আরও অনেকের কাছেও হয়তো এমনি ভাবে নিজেকে সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। অল্পক্ষণ আগে বরযাত্রীরা আসিয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে হাজার দায়িত্ব শিকল বাঁধা কয়েদীর মত তাঁকে টানিতেছে, এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় তাঁর নাই। তবু মিহিরের মত তুচ্ছ মানুষের কাছে এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া তিনি যেন নড়িবেন না যে জহরকে বর্জন করাই তাঁর উচিত হইয়াছে, অন্য কোন উপায় তাঁর ছিল না।

'তা ছাড়া কি জান, সন্ধ্যার পর সহরে বাড়ীর বাইরে আসতে পায় না। অবশ্য আমি—'

মিহির তা জানে। রায়বাহাদুর চেষ্টা করিলে সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে কেন, যখন খুসী গ্রামের বাহিরেও জহর যাইতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিতে রায় বাহাদুরের সাহস হয় না।

ইচ্ছা হয় তো হয়। ধর্মোন্মাদের পথভ্রান্ত মানুষকে স্বর্গের একমাত্র পথটি দেখাইয়া দিবার ইচ্ছার মত জহরকে দলে ভিড়ানোর সাধ হয় তো রায় বাহাদুরের জাগে। নিজের কাছে তিনি অপরাধী

হইয়া আছেন। তিনি যাকে স্নেহ করিতেন, কাছে রাখিয়া যাকে পড়াইতেন, যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া মেয়েকে চিরদিন কাছে রাখিবার কল্পনা করিতেন, সেই এমন ভাবে বিগড়াইয়া গেল ? হবু শিষ্য হাত ফসকাইয়া নামাবলী গায়ে জড়াইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া মূর্তি পূজা আরম্ভ করিলে পাদরী সায়েবের যেমন হয়, রায় বাহাদুর তেমনি ব্যথা পাইয়াছেন।

জহরের বাড়ী বেশী দূর নয়। বাবুদের প্রকাণ্ড দীঘিটির কাছে পথ দক্ষিণে বাঁকিয়াছে, বাঁকের মাথায় দাঁড়াইলে এদিকে রায় বাহাদুরের এবং ওদিকে প্রায় সমান দূরে জহরের বাড়ী চোখে পড়ে। বাড়ীর সামনে জহর সখ করিয়া সহুরে ঠাস বুনানির বাগান করিয়াছিল, গ্রামের আম বাগান আর জঙ্গলের পটভূমিকায় সে বাগানের নিখুঁত জ্যামিতিক পরিকল্পনা ও যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা বছর চারেক আগে বিস্ময়ের মত মিহিরের চোখে পড়িয়াছিল। বাগানটি টিকিয়া আছে বটে, রেখা, কোণ ও বৃত্তগুলিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, চাকচিক্য চলিয়া গিয়াছে। দেখিলেই বুঝা যায় বহুদিন বাগানটি কারও যত্ন পায় নাই। এটা মিহিরের কাছে আরও বড় বিস্ময়ের মত ঠেকিল। বাড়ী বসিয়া জহরকে কর্মহীন অলস জীবন যাপন করিতে হয়, এতবড় পৃথিবীতে শুধু এই গ্রামটি তার গতিবিধির সীমা, সময় কাটানোর জন্য সখের বাগানটির দিকে সে তাকায় না কেন ?

সদরের ভেজান দরজা অল্প একটু ফাঁক করিয়া কে যেন সন্তর্পণে উঁকি দিতেছিল, শেষ বেলার বাঁকা রোদের আলোয় শুধু চশমার কাঁচ ঝিকমিক করিতে দেখা গেল !

বারান্দায় উঠিয়া মিহির দরজার সামনে ইতস্ততঃ করিতেছে,

ভিতর হইতে চাপা গলায় ডাক আসিল, 'চলে আয়, চট করে চলে আয় ভেতরে। ওখানে দাঁড়াস না। কেউ দেখবে।'

ভিতরে ঢোকা মাত্র জহুর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অনুযোগের সুরে বলিল, 'বাড়ীর সামনে অতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলি কেন? তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই মিহির।'

নির্বাক মিহিরের দু'চোখের বিস্মিত প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া জহুর তাকে ভিতরে নিয়া গেল। সদরের দরজায় যে খাপছাড়া অভ্যর্থনা আরম্ভ করিয়াছিল বাড়ীর ভিতরে জহুর তার জের টানিলে মিহির হয়তো আপনা হইতেই তার প্রশ্নের জবাব পাইয়া যাইত। উঠানে পা দিয়াই সে যেন অন্য মানুষ হইয়া গেল।

'তুই আসবি ভাবিনি। অনেক দিন পরে দেখা হল।'

'বছর চারেক হবে বৈকি।'

তিন বছর জহুর জেলে ছিল। এক বছর বাড়ীতে আছে। এই হিসাবে চার বছর। মাঝখানে সরকারী কাজে মিহির একবার জহুরের জেলে গিয়া জহুরকে দেখিয়াছিল বছর দুই আগে। জহুরও হয়তো তাকে দেখিতে পাইয়াছিল, চাকরীর পোষাকে চিনিতে পারে নাই। সে কি চাকরী করে হয়তো আজও এ বাড়ীর কেউ জানে না। এতক্ষণ পরে হঠাৎ মিহির অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। জহুরের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়া তার নূতন ছাপমারা পরিচয় জানিবার পর বাড়ীর সকলের অস্বস্তি-বোধ যেন কল্পনায় এখন হইতে তার নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে।

'না এসে পারলাম না জহুর।'

'তা জানি।'

জহুরের বাবা কাঁথা মুড়িয়া দিয়া শুইয়াছিলেন, জ্বর আসিয়াছে।

তাঁকে প্রণাম করা গেল না। শায়িত অবস্থায় মানুষকে প্রণাম করিলে তার অকল্যাণ হয়, একেবারে চরম অকল্যাণ। কারণ, শোয়া বসা যখন সমান হইয়া যায় তখনই মানুষকে এ অবস্থায় প্রণাম করা হয়। কঠোর নীরস জীবনের প্রতীকের মত শুকনো চামড়ায় ঢাকা ভদ্রলোকের মুখের হতাশা সাতদিনের খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি আড়াল করিতে পারে নাই, জ্বরের ঘোরের প্রলাপেও চোখের তীব্র প্রতিবাদ চাপা পড়ে নাই। তবু এখনো তার অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে।

ছোট বড় সব রকম অমঙ্গলের আশঙ্কা। মিহিরের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিয়াই তিনি শুইয়া শুইয়া চড়া গলায় তাগিদ জানাইতে আরম্ভ করেন, 'কি করছ তোমরা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও? আমি যেতে পারছি না, তোমরাও দেরী করে যাবে, এক ফোঁটা আক্কেল কি কারো নেই তোমাদের? আরও সর্বনাশ ঘটাতে চাও মানুষটাকে চটিয়ে?'

জহরের মা বলেন, 'এই যাই, ওরা কাপড় পরছে।'

কতক্ষণ লাগবে কাপড় পরতে? সর্বনাশ করবে তোমরা। আমার সর্বনাশ করবে।'

মিহিরকে আশীর্বাদ করার কাজটা তাড়াতাড়ি করিয়া তিনিও বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন। জহরের দাদা মনোহর বোধ হয় তাদের সঙ্গে নিয়া যাইবে, ফর্সা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া কাঁধে চাদর ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া মোড়ায় বসিয়া আছে। গম্ভীর নির্বাক লোকটির বসিবার ভঙ্গিতে পর্যন্ত যেন ক্ষোভ রূপ ধরিয়া আছে।

মিহিরকে দেখিয়াও এতক্ষণ একটি কথা বলে নাই। মিহির নিজেই কাছে গিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন মনুদা?

'আছি এক রকম।'

খুব হাসিখুসী ছিল মানুষটা, ছেলেমানুষের মত ক্যারম খেলিতে বড় ভালবাসিত। খেলার সময় ক্যারমের গুটি নিয়া মুখে পুরিয়া বিরক্ত করার জন্য একবার নিজের দেড় বছরের ছেলেকে একটা চড় বসাইয়া দিয়াছিল, মিহিরের মনে আছে। আরও মনে আছে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কোলে তুলিয়া সকৌতুক অনুতপ্ত হাসির সঙ্গে বলিয়াছিল, 'তুই? আমি ভাবলাম বিড়াল বুঝি!'

'ছুটিতে আছেন?'

'ছুটি? কিসের ছুটি? ছুটির পালা ঢের দিন সাঙ্গ হয়ে গেছে।'

কথা বলিলেই খেঁকি কুকুরের ভদ্রতায় জবাব আসে। কৌতূহল চাপিয়া মিহির চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে মনোহর আপনা হইতেই কথা বলিল, এবার গলাটাও মনে হইল একটু মোলায়েম।

'চাকরী নেই ভাই।'

'ছেড়ে দিয়েছেন?'

'তুমি পাগল নাকি, চাকরী ছেড়ে দেব? ছাড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে ওই ভাইরূপী মূর্তিমান শনি জুটেছেন আমাদের, সর্বনাশ করে ছাড়লে একেবারে।'

জহর কাছে দাঁড়াইয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল, এতক্ষণ পরে মনোহরও মুখ ফিরাইয়া তার দিকে চাহিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাই-এ ভাই-এ দৃষ্টির যে মিলন ঘটিতে দেখিল জীবনে কখনো মিহির ভুলিতে পারিবে না। খুনীর সংস্পর্শে তাকে আসিতে হইয়াছে, সামনে দাঁড় করাইয়া খুনীকে সে জেরা করিয়াছে, কিন্তু সেটা খুনের পর। খুনীর চোখে তখন শুধু প্রতিক্রিয়া আর আইনের

উন্মত্ত প্রতিহিংসার ভয়। আগের বা পরের নয়, ঠিক খুনের সময়ের দৃষ্টি যেন মনোহরের চোখে আসিয়াছে। এ দৃষ্টির আর কোন মানে হয় না। জহরের চোখে শুধু বিফলতা, দুর্বোধ্য আঘাতের অর্থ বুঝিবার ব্যাকুলতা যেন ভিতর হইতে তার চোখে চাপ দিতেছে। ঢোঁক গিলিতে গিয়া মিহিরের মনে হইল কণ্ঠনালীর মাঝখানে শক্ত ঢিলের মত কি যেন একটা আটকাইয়া গিয়াছে।

রায়বাহাদুরের মেয়ের বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার জন্য পাশের ঘরে মেয়েরা সাজ করিতেছে। স্বাভাবিক কলরব ছাপাইয়া জোর গলায় চেঁচামেচি কাণে আসিতেছিল। হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। আধফর্সা ময়লা কাপড় পরা ষোল সতের বছরের একটি রোগা মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মা এ ঘরে দাঁড় করাইয়া দিলেন। পিছু পিছু আসিল একটি বৌ এবং পাঁচটি ছেলেমেয়ে। পরণে পুরানো ছিটের ফ্রক ও জামা।

মা বলিলেন, ‘শান্তি যাবে না বলছে। যেতে ভাল লাগছে না মেয়ের, ইচ্ছে করছে না। দাদাকে যেতে বারণ করে গেছে, মেয়ের তাই অপমান হয়েছে, তিনি তাদের বাড়ী থুতু ফেলতেও যাবেন না।’ বিছানা হইতে বাবা বলিলেন, ‘যাবে না কি, ওর ঘাড় যাবে। শিগগীর কাপড় পরে নে গিয়ে শান্তি।’

শান্তি বলিল, ‘আমি যাব না।’

মা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ‘দিদি যখন সুধোবে শান্তি কই, আমি কি জবাব দেব লো হারামজাদি? মরে গেছিস, হাড় জুড়িয়েছে, তাও যে বলতে পারব না, পুকুর ঘাটে ওবেলা তোকে দেখেছে নিজের চোখে।’

দরজার কাছ হইতে বৌটির নীচু ঝাঁঝালো গলার মন্তব্য শোনা গেল, 'ভাই চাকরী খেয়েছেন, রায় বাহাদুরকে ধরে একটু সুবিধের চেষ্টা দেখবে দাদা, তা কেন সইবে বোনের।'

মনোহর মোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া শান্তির সামনে দাঁড়াইল।

'যাবি না তুই? যাবি না?'

শান্তি বোধ হয় মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়াছিল, মিহিরের চোখে পড়ে নাই। শান্তির গালে মনোহরের চড়টাই শুধু তার চোখে পড়িল, শব্দটা কাণে আসিল।

তারপর শান্তি কোথায় গেল কে জানে, অন্য সকলে দল বাঁধিয়া রায় বাহাদুরের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিয়া গেল। মিহিরের মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল, বাড়ীটা হঠাৎ শূন্য হইয়া যাওয়ায় এবার যেন রীতিমত ভয় করিতে লাগিল।

'এবার যাই জহর।'

'খিড়কির দরজা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে যাবি?'

'খিড়কির দরজা দিয়ে যাব কেন?'

'তোর যদি কোন ক্ষতি হয়!'

'তুই পাগল হয়ে গেছিস জহর।

সদরের দরজার কাছে গিয়া মিহির একটু দাঁড়াইল। জহরের সঙ্গে এক রকম কোন কথাই বলা হয় নাই। এ বাড়ীতে এতক্ষণ তার নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হইতেছিল, সোজাসুজি রায় বাহাদুরের বাড়ীতে হট্টগোলের মধ্যে হাজির হইলে নিশ্বাস বোধ হয় তার বন্ধই হইয়া যাইবে।

'দীঘির ঘাটে গিয়ে বসব চল জহর।'

'আমি? ও বাবা, ঘরের বাইরে গেলে রক্ষা আছে!'

'কি বকছিস পাগলের মত ? আয় ।'

সদরের দু'পাট দরজা খুলিয়া মিহির জহরের হাত ধরিতে গেল। অস্ফুট একটা ভয়ের শব্দ করিয়া জহর ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তারপর শান্তি আসিয়া বলিল, 'আপনি যান! ছোড়দা কখনো বাড়ীর বাইরে যায় না।'

'কেন ? ওর তো বাইরে যেতে বারণ নেই ?'

'তা নেই। ছোড়দার মাথাটা একটু কেমন হয়ে গেছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিন, এ দরজাটা খোলা থাকলে ছোড়দা ভয় পায়।'

মিহির বাহির হওয়া মাত্র শান্তি সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রায় বাহাদুরের বাড়ীর শানাই-এর সুর শুনিতে শুনিতে তার মাথাটাও খুব সম্ভব একটু কেমন হইয়া গিয়াছিল।

মানুষ হাসে কেন

পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যার সময় রসময় ডাক্তারের বৈঠকখানা—ডিসপেনসারীতে হাসিগল্পটা একটু বেশী জমিয়াছিল। হাসিগল্প রোজই চলে, পাড়ার দু'পাচজন ভদ্রলোক প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে আসিয়া জড়ো হয়, তবে পাড়ার বিপিন সরকার যেদিন উপস্থিত থাকে, হাসি আর গল্প দুয়েরই মাত্রা চড়িয়া যায়। বিপিন বাড়ায় গল্পের পরিমাণ, হাসিটা বাড়ায় অন্য সকলে।

কেবল হাসে না রসময় আর তার কুড়ি টাকা বেতনের ছোকরা কম্পাউণ্ডার রতন। ছোট ঘরোয়া ডিসপেনসারী, শিশি বোতল, সাজানো বুক-শেলফটি ধরিলে ওষুধের আলমারি হইবে সাড়ে তিনটি, সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ সাড়ে তিন শিশি ওষুধও বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ। বিরাট ডিসপেনসারী হইলেও এ পাড়ায় এ রাস্তার ধারে তার চেয়ে বেশী ওষুধ বিক্রয় হইত না। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার দুজনেই তাই হাসিগল্প শুনিবার অবসর পায়। রসময়ের তবু মোটামুটি পশার আছে, কখনো বাহিরে ডাক আসে, কখনো রোগী আসে, আগাগোড়া বন্ধুদের সশব্দ আনন্দে ভাগ বসানোর সুযোগ সে প্রায়ই পায় না, কোনদিন একেবারেই পায় না। রতন কিন্তু আলমারির পিছনে তার ওষুধ তৈরীর খোপে ঢুকিবার সরু পথটির সামনে সমস্তক্ষণ টুলে বসিয়া থাকে, রসময়ের রোগী দেখিবার খোপটির কাঠের দেয়ালে আরামে হেলান দিয়া সকলের প্রত্যেকটি কথা শোনে। কিন্তু একটু মুচকি হাসিও কখনো হাসে না।

রসময়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারা, একটু ভুঁড়িও আছে। মাথার অর্ধেকের বেশী চুল তার সাদা, গোলগাল তেলতেলা মুখে চ্যাপ্টা চিবুকের উপর চোখা নাক। সকলের হাসিতে যোগ না দিলেও তার ঠোঁটে একটু টান পড়ে, মুখের স্বাভাবিক, মৃদু অমায়িক ভাব গভীর ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মুখের এই পরিবর্ত্তনকে মুচকি হাসি নাম দিলেও দেওয়া যাইতে পারে। তবু, রতন যে আগাগোড়া মুখ গোমড়া করিয়া চাহিয়া থাকে, কেউ তা এক রকম খেয়ালও করে না, রসময়ের হাসির অভাবটাই সকলের নজরে পড়ে।

নিজের রসিকতায় বিপিন নিজে কদাচিৎ হাসে, তবু সে মাঝে মাঝে চটিয়া যায়। আড়ালে বন্ধুদের বলে, 'হাসবে কি, লোকটা বড় ভোঁতা। রসজ্ঞান নেই।'

পেনসনভোগী উমাচরণ রসিকতা করিয়া বলে, 'ভোঁতা? রসজ্ঞান নেই? এই বয়সে যে অমন একটি সুন্দরী তরুণীর পাণিগ্রহণ করতে পারে, তার মত চোখা আর রসে টইটম্বুর কে আছে!' বলিয়া শীর্ণ গলার জীর্ণ আওয়াজ চরমে তুলিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়াই সশব্দে হাসিতে আরম্ভ করে। হাসিতে হাসিতে উৎসুক দৃষ্টিতে রাস্তার আলোয় সঙ্গীদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া ভাখে। কারও মুখে হাসির চিহ্ন নাই দেখিয়া হঠাৎ নিজেও থামিয়া যায়। বিপিনের প্রায় প্রত্যেকটি রসিকতায় সকলে হাসে কিন্তু তার আরও জোরালো আরও যোগসই রসিকতাগুলিকে কেউ আমল দেয় না কেন উমাচরণ বুঝিতে পারে না। ঈর্ষায় তার বুক জ্বলিয়া যায়। সকলকে হাসানোর কত চেষ্টাই যে সে করে।

রোগী আসিলে সকলে হাসি থামায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সহজে থামায় যে নিজের নতুন গাড়ীটার কথা রসময়ের মনে পড়িয়া যায়। রসময়ের হাসি পায়। ঠোঁট তার ফাঁক হইয়া যায়, কিন্তু সে হাসে না, রোগী আসিয়াছে বলিয়া গম্ভীর মুখেই রোগীর দিকে তাকায়।

পূর্ণিমার আগের সন্ধ্যায় রসময় বাড়ীর ভিতর হইতে সকলের হাসি শুনিতেছিল। হঠাৎ হাসি থামিয়া যাওয়ায় বুঝিতে পারিল রোগী আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতরে রোগীও ছিল, হাসিও ছিল। রসময়ের মেয়ে নলিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, নলিনীর সাত বছরের ছেলে পণ্টুর পোকায় ধরা দাঁতে ব্যথা হইয়াছে, বাড়ীর পুরানো ঝি বুড়ির পা ফুলিয়াছে এবং রসময়ের বড় ছেলে হেমন্তের বৌ সরস্বতীর মাথা ধরিয়াছে। হাসি চলিতেছিল রসময়ের নিজের ঘরে। হাসিতে হাসিতে তার বিধবা বোন সুহাসিনীর দম থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া আসিতেছিল। রসময়ের বৌ রাণী আর সুহাসিনীর মেয়ে অরুণা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল আর মিনিট খানেক গম্ভীর বিষন্ন মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ মিনিট খানেকের জন্য খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল রাণীর সখি উমাচরণের মেয়ে পূর্ণিমা।

মেয়েদের হাসানোর জন্যই গ্রামোফোনের হাসির রেকর্ড তৈরী হয়, রসময় তা জানিত। তবু এদের এমন করিয়া হাসানোর মত রেকর্ডে কি আছে আবিষ্কার করার জন্য ঘরের বাইরে বাড়ান্দায় বসিয়া সবে গড়গড়াটি টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি করিয়া যে ঘরের মধ্যে সকলে তার উপস্থিতি টের পাইয়া গেল! সুহাসিনীর হাসির আওয়াজ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হইয়া গেল নীচে ডিসাপেনসারীর হাসি।

রতন আসিয়া বলিল, 'আপনাকে ডাকছে।' বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

রসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে? হাসছ যে?'

রতনের হাসি যেন থামিতে চায় না। রসময়কে সে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে গেলে মুখে কথা আটকাইয়া যায়। কিন্তু কি যেন এক কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে যার ফলে রসময়ের ভৎর্সনাভরা দৃষ্টির সামনেও বেয়াদপের মত না হাসিয়া সে পারিতেছে না। তবে রসময় ধমক দিতেই সাউণ্ড বক্সের স্পর্শবঞ্চিত রেকর্ডের মত তার হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল, সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক বাতি নেভানোর মত মুখে কৌতুকের দীপ্তি ঘুচিয়া দেখা দিল কালো ভয়ের ছাপ। আমতা আমতা করিয়া সে বলিল, 'আজ্ঞে না, কিছু না, এমনি। সিড়ি দিয়ে উঠবার সময় পাটা হঠাৎ এমন পিছলে গেল—'

'তাতে হাসবার কি আছে?'

অন্য সময় রতন হয়তো কোন কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা না করিয়াই চম্পট দিত, এমন একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ায় বোকার মত বলিল, 'প্রথমে বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল, তারপর নতুন কাকীমার বাবার কথা মনে পড়ে হঠাৎ কি যে হল—'

রতন করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। একি কখনো মানুষকে বুঝানো চলে, ব্যাখ্যা করা চলে, কেন সে হাসিয়াছে? কারণটাই যে অর্থহীন, যুক্তিহীন, থাপছাড়া! রসময়ের মনে পড়িয়া যায়, আজ সকালে রাণীর বিপুলদেহ পিতৃদেব, তার নতুন শ্বশুরমশায়, মেয়েকে দেখিতে আসিয়া পা পিছলাইয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। নীচে পড়িয়া সেই বয়স্ক স্থূল মানুষটির কী কান্না! রতন তাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে আনিয়াছিল, তার হাস্যকর পতন ও ক্রন্দন দেখিয়াছিল, হাস্য

পা ধরিয়া টানিয়া দিয়া কপালের ফুলায় মলম মালিশ করিয়া শুশ্রূষাও করিয়াছিল। তখন রতনের মোটেই হাসি পায় নাই। দৃশ্যটি স্মরণ করিয়াই এখন হাসি পাইয়া গেল কেন ?

নীচে নামার আগে রসময় একবার শয়ন-ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া গেল। রাণী মাথার ঘোমটা ইঞ্চি দুই বাড়াইয়া দিল, সুহাসিনী স্মিতমুখে বলিল, 'একটু শুনে যাও না দাদা ? বড় মজার রেকর্ড। হাসতে হাসতে মরি আর কি! একজনের সোয়ামী অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে এসেছে, স্ত্রী তাকে চিনতেই পারল না, ভাবল চোর ডাকাত হবে বুঝি! সোয়ামী যেই আদর করার জন্য স্ত্রীর দিকে দু'পা এগিয়েছে—'

'আমার রোগী এসেছে। রেকর্ড শোনার সময় নেই।'

রসময় চলিয়া গেলে হাসিমুখেই সুহাসিনী সকলকে শুনাইয়া নিজের মনে বলিল, 'দাদা সে এমন মুখ গোমড়া করে থাকে কেন বুঝি না বাবু। ছেলেবেলা থেকে এমনি স্বভাব। লুরেল হোর্ডির ছবি দেখে পর্যন্ত একবারটি হাসে না, যেন হাসা পাপ।'

রাণী তা জানে। সখি পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া সে শুধু মুচকিয়া একটু হাসিল। সুহাসিনীর মুখে দু'জন নাম করা ফিল্ম অভিনেতার নামের অদ্ভুত উচ্চারণ শুনিয়া পূর্ণিমা আগেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণিমা একটু তোতলা। কথা বলার চেয়ে কথায় কথায় হাসিতে সে বেশী ভালবাসে। তার হাসিতে তোতলামি ধরা পড়ে না।

রোগী আসে নাই, প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে ডাক আসিয়াছে—পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী। দুটি বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান কেবল হাত তিনেক চওড়া একটা গলির। কয়েকদিন আগে পাশের বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন রাত প্রায় ন'টার সময়

এ্যাস্‌পিরিন কিনিতে আসিয়া রসময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ও করিয়া গিয়াছে। নাম পরেশ, ছাব্বিশ সাতাশের বেশী বয়স হইবে না। রোগা লম্বা অতি সুদর্শন চেহারা, টুকটুকে ফর্সা গায়ের রঙ। কেবল হাতলহীন নাক-কামড়ানো চশমার জন্য একটু কেমন দেখায়।

পরেশ নিজেই রসময়কে ডাকিতে আসিয়াছিল, অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রসময়কে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিল, 'শীগগীর আসুন ডাক্তার বাবু। আমার স্ত্রীর বুক ধড়ফড় করছে।

রসময় কয়েকটি প্রশ্ন করিল, কিন্তু পরেশের স্ত্রীর যে ঠিক কি হইয়াছে কিছুই বুঝতে পারিল না। পরেশ নিজেও জানে না! ব্যাপার এই, দু'জনে তারা কথা বলিতেছিল, হঠাৎ বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হওয়ায় পরেশের স্ত্রী বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, বলিয়াছে, 'শীগগীর ডাক্তার ডাকো। আমার বুক ধড়ফড় করছে।'

পরেশের বিবর্ণ মুখ আর অধীরতা দেখিয়া আর বেশী কিছু রসময় জিজ্ঞাসা করিল না, রতনকে ব্ল্যাডপ্রেসার পরীক্ষার যন্ত্রটা আনিতে বলিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া পরেশের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

প্রতিবেশী,—একেবারে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী। তবে নতুন আসিয়াছে, বিশেষ আলাপ পরিচয় ঘনিষ্টতা একরকম নাই বলিলেও চলে, ফি'টা সম্ভবত ফাঁকি দিবে না। ফাঁকি দিলে অবশ্য কিছু বলা চলিবে না, পাশের বাড়ীতে যারা থাকে তারা তো ধরিতে গেলে একরকম আধা ঘরের লোক। বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীর জন্য ডাক্তারি করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দোতালায় রোগিনীর ঘরে ঢুকিবার সময়ও রসময় এই কথাগুলি ভাবিতেছিল, বোধ হয় সেই জন্যই ঘরে আর কেউ না থাকিলেও বুঝিতে পারিল না যে খাটে শায়িতা মহিলাটিই পরেশের স্ত্রী। অবশ্য অন্যমনস্ক

না থাকিলেও সহজে কথাটা অনুমান করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। খাটের মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায় বয়স তার ত্রিশের অনেক ওপারে চলিয়া গিয়াছে। গায়ের রঙ পরেশের চেয়েও টুকটুকে, একটু মোটা বলিয়া বোধ হয় রঙটা তার ফুটিয়াছে আরও বেশী। মুখখানা সুন্দর। রসময় ভাবিল, সে নিশ্চয় পরেশের দিদি।

'আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

রসময়ের প্রশ্নের আসল অর্থ অনুমান করা কঠিন নয়, পরেশের মুখখানা লাল হইয়া গেল।

'এই যে শুয়ে আছেন। শান্তি, ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

শান্তি চোখ মেলিয়া এতক্ষণ ডাক্তার বাবুকেই দেখিতেছিল, একটু অভ্যর্থনার হাসি হাসিয়া বলিল, 'আসুন। বসতে একটা চেয়ার দাও ডাক্তারবাবুকে। রসময় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে ?'

শান্তি বলিল, 'বুকটা হঠাৎ কেমন ধড়ফড় করে উঠল। হঠাৎ ভয় পেলে যেমন হয় সেই রকম। এমন ভয়ানক ভয় করতে লাগল আমার—'

শান্তি অনেক কিছুই বলিয়া গেল, অনেক বর্ণনা লক্ষণ, উপমা ও বিবরণ। না, তার কোনদিন হার্টের ব্যারাম হয় নাই, সিঁড়ি দিয়া উঠিলে বুক ধড়ফড় করে না।

'আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ডাক্তারবাবু, কেবল বিয়ের পর তাড়াতাড়ি একটু মোটা হয়ে পড়েছি। আপনি তো পাশের বাড়ীতে থাকেন, না ? জানালায় দাঁড়িয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছি আগেই।'

গলির দিকের খোলা জানালাটি দিয়া রসময়ের ঘরের বন্ধ জানালাটি দেখা যাইতেছিল। মুখোমুখি জানালা, একঘরে দাঁড়াইয়া অন্য ঘরের প্রায় সবটাই নজরে পড়ে। এ বাড়ীতে আগে যারা ভাড়াটে ছিল এ ঘরটা

তাদেরও শয়ন-ঘর ছিল। তারা নিজেদের জানালাটি খোলা রাখিত বলিয়া রসময় নিজের জানালা সব সময় বন্ধ করিয়া রাখিত। তার জানালা সব সময় বন্ধ থাকে দেখিয়াই হয়তো এরাও নিজেদের জানালাটি খুলিয়া রাখিয়াছে।

নাড়ী দেখিয়া রসময় ষ্টেথস্কোপ কানে লাগাইয়া শান্তির বুক পরীক্ষা করিল। তারপর বলিল, 'একবার পাশ ফিরুন তো, পিঠটা একটু দেখব।'

'পিঠ দেখবেন ?'

শান্তির ভাব দেখিয়া মনে হইল হঠাৎ সে যেন বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। জোরে একটা ঢোক গিলিয়া বেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে পাশ ফিরিল। রসময় একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। এইমাত্র সে যার বুক পরীক্ষা করিয়াছে, পিঠ পরীক্ষা করিতে দিতে তার বিব্রত বোধ করার তো কোন অর্থ হয় না।

পিঠের বাঁ প্রান্তের পাঁজরের উপর ষ্টেথস্কোপের মুখটা বসানো মাত্র শান্তির সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ষ্টেথস্কোপের মুখটা রসময় যেই একটু মেরুদণ্ডের দিকে সরাইয়াছে রোগিনীর দেহে একটা ভূমিকম্প ঘটিয়া গেল। প্রচণ্ড হি হি হাসির শব্দে ফাটিয়া পড়িয়া ধড়ফড় করিয়া শান্তি উঠিয়া বসিল, চোখের পলকে খাট হইতে নামিয়া একেবারে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। পরেশ গম্ভীর মুখে বলিল, 'ওর পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি।

রসময় বলিল, 'তাই দেখছি।'

কিন্তু রসময় দেখিতেছিল অন্য জিনিষ। লুটানো শাড়ীর আঁচল টানিতে টানিতে পালানোর সময় শান্তির যে অবস্থা হইয়াছিল তাতে ভদ্রলোকের তার দিকে তাকানো চলে না, রসময় তাই তাড়াতাড়ি

চোখ ফিরাইয়া খোলা জানালা দিয়া নিজের ঘরের জানালার দিকে তাকাইয়াছিল। ইতিমধ্যে কখন একটি খড়খড়ি উঁচু হইয়া গিয়াছে এবং কে যেন ভিতর হইতে উঁকি দিতেছে।

পরেশ শান্তির খোঁজ নিতে যাইতেছিল, রসময় তাকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখুন, আপনার স্ত্রীর হার্ট ভালই দেখলাম, ভয়ের কিছু নেই। খুব সম্ভব নার্ভাসনেসের জন্য বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। ব্লাডপ্রেসারটা নেওয়া দরকার, তা সেটা কাল সকালে এক সময় নিলেই চলবে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়?

'কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না।'

আরেকবার আশ্বাস দিয়া রসময় উঠিল। ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষার যন্ত্রটি লইয়া রতন ঘরের মধ্যে দরজার কাছে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়াছিল, সমস্ত গণ্ডগোলের জন্য সেই যেন দায়ী। রসময় তাকে ফিরিয়া যাইতে বলা মাত্র যন্ত্রের মত পাক দিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

রসময় সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, পরেশ দুটি টাকা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'আপনার ফি'টা ডাক্তারবাবু।'

রসময় মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িল। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব হয়েছে, আর কি ফি নেওয়া চলে? একদিন বরং নেমন্তন্ন খাইয়ে দেবেন, বাস, তাতেই হবে।'

ডিসপেনসারীতে পৌছিতে পৌছিতে রসময়ের ঠোঁট টান করা মৃদু হাসি মুছিয়া গেল। নিজের ঘরের খড়খড়ি উঁচু হইতে দেখিয়া তার বড় রাগ হইয়াছিল। এভাবে পরের বাড়ীতে উঁকি দেওয়ার মানে? সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মনে হইয়াছিল, খড়খড়ি হয়তো রাণীই উঁচু করিয়াছিল। রাণী উঁকি দিয়া তার ডাক্তারি দেখিতেছিল মনে

করিয়া তখন রসময়ের দুই ঠোঁটে মৃদু হাসির টান পড়িয়াছিল। ফি প্রত্যাখান করার ভদ্রতার হাসি সেটা নয়।

ডিসপেনসারীতে সকলেই উপস্থিত আছে কিন্তু হাসিগল্প একেবারেই বন্ধ। বিপিন পর্যন্ত মুখ বুজিয়া আছে। নিজের চেয়ারে বসিয়া রসময় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে সবাই চুপচাপ যে?'

উমাচরণ বলিল, 'দেবেন বাবু মারা গেছেন। রমণীবাবুর ভাই যাচ্ছিল, সেই খবরটা দিল। একেবারে ডুবিয়ে গেল সংসারটাকে।

রসময় বলিল, 'আমায় ডেকেছিল পর্শু। দেখেই বুঝেছিলাম টিকবে না, কোন আশা নেই। ওরকম একটা রোগ হয়েছে, মরমর অবস্থা, তবু আমায় বলে কি, এরাই আমায় ডোবাবে ডাক্তারবাবু,—একটু জ্বর হয়েছে, দুদিন শুয়ে থাকলেই সেরে উঠব, কি যে সব খরচপত্র হাঙ্গামা সুরু করে দিয়েছে!'

মৃদু একটু হাসিতে গিয়া রসময় থামিয়া গেল। রমেশ সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়াছে। মরিবার দুদিন আগে মরণাপন্ন রোগী ভাবে দুদিন বিছানায় শুইয়া একটু বিশ্রাম করিলেই সে সারিয়া যাইবে, এর কৌতুকটা এরা উপভোগ করিতে পারে না। বরং গাম্ভীর্য আর হতাশার ভাবটাই ঘনীভূত হইয়া আসে। কি বিকারগ্রস্তই হইয়া গিয়াছে এদের মন! ক্ষুব্ধ হইয়া রসময় ধমক দেওয়ার মত হঠাৎ বলিল, 'রতন, সাত কাপ চা দিতে বলো।'

উমাচরণ বলিল, 'অত বড় সংসারটা এবার একেবারে ডুবল। অ্যাদ্দিন কোনরকমে তবু চালিয়ে যাচ্ছিল, এবার সব না খেয়ে মরবে।'

রসময়ের হঠাৎ মনে হইল, এদের প্রত্যেকে বোধ হয় ভাবিতেছে, সে মরিয়া গেলে তার মস্ত সংসারটার কি অবস্থা হইবে। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্কেত তো এমন স্পষ্টভাবে আসে না। সকলে হয়তো

ভাবিতেছে দেবেনের সংসারের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতেরই কথা, কিন্তু অনুভব করিতেছে নিজের নিজের সংসারের সম্ভবপর ভবিষ্যৎ কল্পনার আতঙ্ক ও বিষাদ।

আলোচনা ও কল্পনার প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টার রসময় বলিল, 'কত রকম রোগীই দেখলাম। কেউ রোগ হলে ভাবে কিছুই হয়নি, আবার কেউ রোগ না হলেও ভাবে জগতে যত রোগ আছে সব তাকে ধরেছে।'

নিজেকে বিশেষভাবে রোগী মনে করে এরকম কয়েকজন সুস্থ ও সবল মজার রোগীর গল্প রসময় বলিতে লাগিল, সকলে মন দিয়া শুনিতে লাগিল। চা আসিলে কাপে চুমুক দিয়া একজন বলিল, 'তা ঠিক, রোগকে সবাই ডরায়।'

তখন রসময় বলিল, 'আরও কত মজার রোগী আছে। সেদিন একজনকে দেখতে গিয়েছিলাম, তার সারা গায়ে সুড়সুড়ি। পালস্ দেখতে যাই হেসে গড়িয়ে পড়ে, থার্মোমিটার দিতে যাই, হাসতে হাসতে দম আটকে আসে—আধঘণ্টা ধরে কি ধস্তাধস্তিই চলল।'

সকলে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, 'পুরুষ না মেয়েলোক হে?'

'মেয়েলোক।'

সকলের হাসি চরমে উঠিয়া গেল। বিপিন সকলকে হাসায়, নিজে কদাচিৎ হাসে, সে হাসিতে লাগিল সব চেয়ে বেশী। প্রথমটা রসময় খুব খুসী হইয়া উঠিল, তারপর তার মনে হইল, সকলে যেন দেবেনের মৃত্যুসংবাদের পীড়নটা এড়ানোর জন্য হাসিতেছে। একটি স্ত্রীলোক, তার যষ্ঠাঙ্গে অস্বাভাবিক সুড়সুড়ি বোধ, রোগ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার লড়াই করিতেছে আর হাসিতে হাসিতে তার দম আটকাইয়া আসিতেছে—এ দৃশ্য কল্পনা করিলে হাসি পায়, কিন্তু দেবেনের মরণের জন্য মনের

মধ্যে যাতনা ভোগ করিতে না থাকিলে তার গল্প শুনিয়া কেউ এ দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টাও করিত না, হাসিতও না।

কে জানে, সংসারের পীড়নের হাত এড়ানোর জন্যই হয়তো সকলে প্রতি সন্ধ্যায় এখানে গল্প করিতে আর হাসিতে আসে।

রসময় গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকে। সকলের হাসির শব্দের মধ্যেও সে শুনিতে পায়, ঠিক পিছনে ঘড়িটা টিক টিক করিতেছে। একটা খাপছাড়া শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিতে পায়, রতন কাঁদ কাঁদ মুখে মাথার পিছনে হাত বুলাইতেছে। ব্যাপারটা সে অনুমান করিতে পারে। টুলে বসিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে রতন পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিল, চমক দেওয়া জাগরণের আতঙ্কে সবেগে সোজা হইতে গিয়া পার্টিশনে মাথাটা ঠুকিয়া গিয়াছে।

রসময়ের দৃষ্টিপাতে রতন অপরাধীর মত একটু হাসিল।

একটু দূরে আরেকটা ডাক আসিয়াছিল। রোগী দেখিয়া ফিরিয়া রাত্রি এগারোটার পর শুইতে যাওয়ার সময় রসময়ের মনে হইতে লাগিল, দুঃখময় হাসির জগতে সে বাস করে, কিন্তু জগতের কোন হাস্যকর ব্যাপারের সঙ্গে তার যোগ নাই। হয়তো একদিন যোগ ছিল, অল্প বয়সে যখন প্রাণ খোলা হাসি হাসিবার জন্য বাহিরের কোন উপলক্ষ দরকার হইত না, নিজের ভিতরের প্রেরণায় হাসিতে হাসিতে অনায়াসে নিজেই নিজের দম আটকাইয়া আনিতে পারিত। সেদিন অনেককাল চলিয়া গিয়াছে। কতকাল সে যে পাগলের মত হাসে নাই।

কেন হাসে নাই? বড় কোন দুঃখ পায় নাই বলিয়া? দুঃখের লাঙ্গলে মন চষা না হইলে হাসির ফসল ফলিবে না, এতো উচিত কথা নয়। তার জীবনে যে জমকালো শোকদুঃখ আসে নাই, তাই বা কে বলিল। যদি তাই হয় যে তার জীবনের শোকদুঃখগুলি অন্যের

তুলনায় কিছুই নয়, এরকম হইল কেন? কেন সে শোকদুঃখে কাবু হইয়া পড়ে নাই? কোন কিছুকে ভালবাসে নাই বলিয়া? সে যে কোন কিছুকে ভালবাসে নাই, তাই মা কে বলিল! যদি তাই হয় যে তার হৃদয়ের মায়ামমতাগুলি অন্যের তুলনায় একেবারে জলো অনুভূতি, এরকম হইল কেন? তার হৃদয় মন অসাড় বলিয়া? মানুষ হিসাবে সে অস্বাভাবিক বলিয়া? অসাধারণ বলিয়া?......

দার্শনিক চিন্তার পীড়ন তো সহজ নয়, দুর্বল রোগীর মধ্যে কড়া ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মত। বিছানায় বসিয়া রসময়ের মনে হইতে লাগিল, এতকালের শূন্য জীবনটা আজ যেন জঞ্জালে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাঁ হাতটি বুকের উপর রাখিয়া রাণী ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইতেছে। তা ঘুমাক, এ বয়সে ঘুম বেশী হয়। কিন্তু ওকে কেন সে নিজের জীবনে টানিয়া আনিয়াছে? কতটুকু মেয়ে! তার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট! পাড়ার কুমারী মেয়ের সঙ্গে সখিত্ব পাতায়, বয়সে বড় ছেলেমেয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে, নাতিনাতিনীকে আদর করে ছোট ভাইবোনের মত, ঝগড়াও করে, চুরি করিয়া নভেল পড়ে, গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজানোর জন্য সর্বক্ষণ উৎসুক হইয়া থাকে, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া পরের বাড়ীতে উঁকি দেয়—

জানালাটা খোলা পড়িয়া আছে। হয়তো ঘুমাইয়া পড়ার আগে শান্তির সঙ্গে জানালায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথা বলিয়াছিল, বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। রসময় জানালাটা বন্ধ করিতে উঠিয়া গেল। শান্তিদের ঘরের জানালাও খোলা, কিন্তু ঘর অন্ধকার। দু'জনের মৃদুস্বরে কথা বলার আওয়াজ কানে আসিতেই রসময় তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠোঁটে তখন তার একটু টান পড়িয়াছে। ওদের বয়সের পার্থক্য

বেশী নয়, বড় জোর সাত আট বছর। রাণী আর তার বয়সের তফাৎটা ত্রিশ বছরেরও বেশী! শান্তিকে দেখিয়া পরেশের দিদি বলিয়া তার ভুল হইয়াছিল, রাণীকে দেখিলে অন্যের—শান্তি যদি আজ বলিত, আপনি পাশের বাড়ীতে থাকেন, না? জানালায় দাঁড়িয়ে আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি।

রাণীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করার সময় শান্তি হয়তো তাই ভাবিয়াছিল, হয়তো বলিয়াছিল, 'তুমি ডাক্তারবাবুর মেয়ে না?'

রাণী হয়তো সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলিয়াছিল, 'না, উনি আমার স্বামী।' রসময় হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করিল। সে কি প্রচণ্ড হাসি। জগতের একটি হাস্যকর ব্যাপারের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ আবিষ্কার করা মাত্র তার এতকালের গুদামজাত সশব্দ হাসির সমস্তটাই যেন এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চায়।

ঘুম ভাঙ্গিয়া রাণী বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চাহিয়া থাকে। তাতে তার হাসি যেন আরও বাড়িয়া যায়। হাসিতে তার ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু সে পাগলের মত হাসিতে থাকে। হাসি পাইলে মানুষ না হাসিয়া পারিবে কেন?

শেষ